# শাশ্বত তরুণ

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

বঙ্গবাণীর বরপুত্র সাহিত্যাচার্য
স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরীর
পবিত্র স্মৃতির
পূজায়

# ভূমিকা

এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের এগারটি প্রবন্ধের মধ্যে নটি প্রকাশ হয়েছিল ১৩২৩, ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালের 'সবুজ পত্রে'; অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর ও কিঞ্চিৎ ন্যূন ত্রিশ বৎসর পূর্বে। লেখক বরদাচরণ গুপ্তকে এ যুগের বাঙ্গালী পাঠক চেনে না। তার কারণ এই প্রবন্ধগুলির শেষ প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল ১৩৩২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায়, আজ থেকে কুড়ি বৎসর পূর্বে। তার পর খুব সম্ভব বরদাচরণ আর কোনও লেখা প্রকাশ করেন নি। এ প্রবন্ধগুলি যিনি পড়বেন তিনিই অনুভব করবেন এতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের কত বড় ক্ষতি হয়েছে।

'সবুজ পত্রের' যুগে রবীন্দ্রনাথের 'আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচা'বার ডাকে যে কয়েকজন নবীন লেখক সাড়া দিয়েছিল বরদাচরণ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন প্রধান। এ প্রবন্ধগুলি সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষায় সকল রকম জড়তা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধযাত্রা, 'টোটাল ওয়ার'। যে ব্যবস্থা বর্তমানের গতি ও উন্নতির পরিপন্থী তার কায়েমী প্রাচীনত্ব বরদাচরণের মনে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম জাগায় নি। এবং খুব সম্মানিত লোকের কাছ থেকেও এর সপক্ষে ওকালতি শাণিত বুদ্ধিতে চিরে বিদ্রূপের চমকে তার অন্তরের শূন্যতা প্রকাশ করতে এ প্রবন্ধগুলিতে কোথাও দ্বিধা নাই। যাকে মিথ্যা মনে হয়েছে কোনও কারণেই তাকে সোজাসুজি মিথ্যা বলার সাহসের অভাব হয় নি। ত্রিশ বছর পরে এ প্রবন্ধগুলি আবার পড়ে মনে হয়েছে স্থাণুত্ব ও বিকৃতবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই অভিযানের প্রয়োজন প্রবন্ধগুলি লেখার সময় যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে। হিন্দু-আইন সংশোধন সম্পর্কে

'রাও বিলে'র আলোচনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর একটা বড় অংশ তার মনের যে পরিচয় দিয়েছে তাতে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছি। বহু বৎসর পরে হলেও এ প্রবন্ধগুলির পুনঃপ্রকাশ ঠিক উপযুক্ত সময়েই হয়েছে।

ওই লেখাগুলির ভাষা ও স্টাইলের সুকুশল নৈপুণ্য বিদগ্ধ পাঠক-মাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সবুজ পত্রের' নবীন ও নতুন লেখকদের গদ্য রচনারীতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেন, নিজের লেখার আদর্শে ও মুখের কথায়, তার মধ্যে একটি ছিল "ধীরে লেখা ও ধরে লেখা"। মনে ভাব ও বিষয়বস্তু জমা হলেই কলমের মুখে তা সাহিত্যিক আকার নিয়ে আপনি বেরিয়ে আসবে, এই প্রতিভার দাবীকে সাধারণ লেখকের, অর্থাৎ হাজারে নয় শ নিরানব্বই জন লেখকের পক্ষে তিনি বলতেন মারাত্মক। ভাব ও বাচ্যের ভাষায় সুষ্ঠু সহজ প্রকাশ অবলীলাক্রমে আসে না, যত্নে ও আয়াসে লেখককে তা আয়ত্ত করতে হয়। যে লেখকের সে চেষ্টা সফল হয় তার স্পষ্ট ভাষা-প্রয়োগের কৌশলকে মনে হয় অতি স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের সৃষ্টির মতই তার অলক্ষ্যে থাকে বহু উদ্যোগ-আয়োজন। বাংলা গদ্য অবহেলে নয়, অতি যত্ন করে লেখার আদর্শ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর বাংলা গদ্য রচনারীতিতে একটা বড় দান। এ আদর্শ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। এবং তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে 'সবুজ পত্র'-যুগের ও তার পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের গদ্য কেবলমাত্র ভাষা ও স্টাইলের বিচারেও বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ।

চৌধুরী মহাশয়ের যে সকল শিষ্যের উপর তাঁর এই উপদেশের ফল ফলেছিল বরদাচরণ ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান। কি শব্দের

চয়নে, কি বাক্যের গড়নে, বরদাচরণের লেখার কোন্‌ওখানে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই। ভাবের ঠিক উপযোগী শব্দটি তিনি সর্বদা বেছে বের করেছেন, এবং সর্বত্র বাক্যকে এমন গড়ন দিয়েছেন যাতে ঝটিতি অর্থবোধের সঙ্গে কান তৃপ্ত হয়, কখনও বেসুর বাজে না। আর মাঝে মাঝে পদ ও বাক্যে অপ্রত্যাশিতের আনন্দ মনকে নাড়া দেয়। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের যে 'চিঠিপত্র' প্রকাশ হচ্ছে তার পঞ্চম খণ্ডে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লেখা ১৩২৪ সালের ২৩শে কার্তিকের চিঠিতে, এক সংখ্যা 'সবুজ পত্রের' কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ এ সংখ্যাকে বলেছেন "খুব ঘন সবুজ"। এই চিঠিতে এই প্রবন্ধগুলিরই কোনও একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বরদাবাবুর লেখাটিও বেশ সারালো ধারালো এবং রসালো হয়েছে। * * বরদাবাবু তোমার সবুজ পত্রের আসরে ওস্তাদের আসন নিয়েছেন— সাহিত্যের দ্যুলোকে * * নিজের আলোকে আলোকিত"। এই "সারালো ধারালো এবং রসালো" লেখায় যখন তাঁর হাত পেকে এসেছে তখনই বরদাচরণ হাতের কলম ফেলে দিলেন। 'সবুজ পত্রে' এই প্রবন্ধগুলি যখন লেখেন তখন তাঁর বয়স অতি অল্প,—যৌবনের প্রারম্ভ। আজ পরিণত বয়সে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় তাঁর মন পূর্ণ। তাঁর প্রথম বয়সের সাহিত্যিক জীবন যে মুছে যায় নি এতদিন পরে 'সবুজ পত্রের' প্রবন্ধগুলিকে একসঙ্গে প্রকাশ করার ইচ্ছায় তার প্রমাণ পাচ্ছি। এ আশা কি দুরাশা যে এই প্রেরণায় হাতের পরিত্যক্ত কলম আবার হাতে তুলে নেবেন? বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর স্থান শূন্যই আছে।

বৈশাখ, ১৩৫৪

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

# সূচী

# শাশ্বত তরুণ

# শাশ্বত তরুণ

'বয়সে বালক বচনে নয়, সে ছেলেকে মন্দ সকলে কয়'— সাহিত্যের আসরে ঠিক এ কথাটি না হলেও মাঝে মাঝে এবংবিধ মন্তব্য শোনা গিয়ে থাকে। এবং পূর্বপক্ষ এ মন্তব্যের নিরাসকল্পে বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনেকানেক সাহিত্যিকের নজির এনে হাজির করলেও সমালোচকের মন তাতে ভেজে না ; বরং উল্টো বিপত্তিই দাঁড়ায়। কারণ তত্তৎ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সব লেখক নাকি এক এক জন 'অবতার'। কাজেই তাঁদের পক্ষে যা 'লীলাখেলা' সাধারণ সাহিত্যিকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই দূষণীয়।

আমার মন কিন্তু এতে সায় দেয় না। সামাজিক সার্থকতা ওর যাই, আর যতই থাক না, সাহিত্যক্ষেত্রে, আমার বিশ্বাস, উক্ত শ্লোকাংশ নিতান্ত নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়। বচনবিন্যাস-মাত্রকে সাহিত্যসৃজন, আর সাহিত্যকে সর্বথা সামাজিক পদার্থ বলে ধরে নেওয়াতেই আমাদের ওরূপ ভুল হয়ে থাকে। সাহিত্য যদি স্থান, কাল, ও সমাজকে অতিক্রম করে সুদূরকে সন্নিহিত করবার, অজানাকে প্রকাশ করবার, অবহেলিতকে অনুরঞ্জিত করবার সংকেত না জানত, মানুষের ভবিষ্যতের আশার নীহারিকাকে যদি আকার দিতে না পারত, শতেক পাকে তা যদি বর্তমানের বস্তুতন্ত্রতার বজ্র-আঁটুনিতেই

বাঁধা পড়ে থাকত, তবে তার যে বিশেষ আদর হত সমাজে এমন ত আমার বোধ হয় না। কারণ, ওরূপ বস্তুতন্ত্র-সাহিত্যের ত্রিবিদ্যা ত জাতিবর্ণনির্বিশেষে ঘরে ঘরে, কাগজে-কলমে না হোক, কায়মনোবাক্যে—আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সবাই সাধন করে আসছি।

অভিজ্ঞতা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুভূতিই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ। বেদমন্ত্রে যতক্ষণ না মৃৎপ্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, ততক্ষণ তা যেমন নিতান্ত জড়সমষ্টিমাত্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যসৃজনপ্রয়াসও তেমনই কথার কথা। অস্থি-সমাবেশ-পরিশূন্য জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়, কিন্তু চেতনালেশ-পরিহীন প্রাণীর কল্পনাও অসঙ্গত।

অধিকাংশ স্থানে সাহিত্যের সমালোচনার ছলে আমরা অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে তার জড় দেহটারই জরিপ করে থাকি। তারই ফলে নির্ভুল সমালোচনাও অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

অনুভূতি পদার্থটি আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার সাথে কোনো আপেক্ষিক অনুপাত রক্ষা করে চলে না। তা যদি চলত তা হলে সামাজিক উপন্যাস কেবল সমাজপতি মহাশয়দের হাত থেকেই বেরুত। অবিনাশবাবুও হয়ত 'কার্ষিক উপন্যাস' লিখতেন না; আর দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন 'রায়' আর 'রিপোর্ট' লিখেই কেটে যেত—অন্ততঃ 'রাণা

প্রতাপ', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাসের' মত নাট্য-সাহিত্য তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হত না।

সাহিত্য বৈষয়িক-অভিজ্ঞতাগতপ্রাণ নয় বলেই এ ক্ষেত্রে বয়সের বিচার নেই। 'নবীন সাহিত্যিক' 'প্রবীণ সাহিত্যিক' আদি করে কথাগুলো নিতান্তই নিরর্থক। সাহিত্যে দাদা-মশাইএর লম্বাই-চৌড়াইও যেমন নিষিদ্ধ, খোকাবাবুর চাঁদ ধরবার আবদারও তেমনই অচল। 'অমৃতং বালভাষিতম্'— সাহিত্য-বিচারে এ কথা খাটে না। কারণ সাহিত্য ত ভাষিত হয় না; আর 'শতং বদ', 'একং মা লিখ', এ যুগ্ম অনুজ্ঞার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আশা করি সবাই নিঃসন্দেহ।

সত্য এবং সতেজ অনুভূতির দ্বারা উদ্দীপ্ত না হলে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি কখনও স্বাভাবিক বা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না। পঞ্চাশোর্ধ্বে তৃতীয় পক্ষে ষোড়শীর পাণিপীড়ন করে অলঙ্কারের শিঞ্জনে প্রীতির অভিনন্দনের অভাব দূর করবার প্রয়াস যেমন নিতান্তই পণ্ডশ্রম, অনুভূতির পরশমণির অভাবে অভিজ্ঞতার ইট-পাটকেল দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির আশাও ঠিক তেমনই বিড়ম্বনা। এ বিড়ম্বনার অবতারণা যাঁরা করেন পাঠক-সাধারণের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের নয়। এবং উক্ত আনাড়ি সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ 'আক্কেল দেবার' অভিপ্রায়েই সাহিত্য-সৃষ্টির নামে তাঁরা নিত্য নূতন 'সাহিত্য পাঠ' রচনা করে থাকেন। পরের অজ্ঞতাকে অবশ্য-স্বীকার্য, আর নিজের বুদ্ধিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েই তাঁরা

সাহিত্যের ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, তাঁদের অনায়ত দৃষ্টির সম্মুখে সাহিত্যের প্রসার স্বতই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।

'শিক্ষা' জিনিসটা অত্যন্ত দরকারী—তাতে আর সন্দেহ কি? দেশ যাতে সুশিক্ষিত হয়, দেশের লোকের মতিগতি রীতিনীতি যাতে বিপথগামী না হতে পারে, দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সবাই যাতে স্বেচ্ছায় কর্তব্য-পালনে উন্মুখ হয়ে ওঠে, এক কথায়, দেশের যেখানে যেমনটি হওয়া উচিত সেখানে ঠিক তেমনটি যাতে গড়ে ওঠে, আর, যেখানে যা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার সেখান থেকে তা উঠে যায় যাতে, এমনতর শিক্ষার সূত্রপাত এবং অনুষ্ঠান যে, দেশের মনীষিগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত—একথা সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মানুষের অভাব এত বহুবিধ, প্রতিভা এত বহুমুখী আর প্রকৃতি এতই বিচিত্র যে, দেশের সমুদয় সাহিত্য-প্রচেষ্টাই যে একই সাধারণ সূত্রের অনুবর্তী হবে এমন আশা করাও সমীচীন হবে না।

সাহিত্য আর সমাজে ত গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নয়; সাহিত্য-রসিকের সাথে সমপ্রাণতা স্থাপনাই হয়েছে সাহিত্যিকের চিরদিনের লক্ষ্য। নিবিড় আলিঙ্গনে পাঠকের প্রাণে প্রাণে অনুভূতির আনন্দ এবং সমবেদনার আবেগ ছড়িয়ে দেওয়াই ত সাহিত্যিকের কাজ। যে নবচেতনার উৎস সাহিতিকের প্রাণে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভাষার সহায়তায় তাকে দিকে দিকে

দেশে দেশে প্রেরণই হয়েছে সাহিত্যিকের সাধনা। যে ভাবনায় সাহিত্যিক বিভোর তা অপরের পক্ষে অভাবনীয় নয়, অচিন্ত্যও নয়, এমন কি অনেকের কাছে অননুভূতপূর্বও না হতে পারে। এই ভরসাই ত সাহিত্যিককে মুখর করে তোলে। নিজের অনুভূতিকে পরের কাছে যাচাই করবারও যে একটা আগ্রহ আছে, সেই আগ্রহের ঐকান্তিকতাতেই ত সাহিত্য-সাধকের মানস-মূর্তি তার লেখার ভিতর বিকসিত হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে গুরু নয়, উপদেষ্টা নয়—সখা। লেখক আর পাঠকের এই যে ঐক্যবিধান, এইখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। সাহিত্য থেকে যদি কখনও সমাজের কোনো 'উপকার' হয়, তা হলে, তা এই পথেই আসবে। তার অগ্রদূত হবে, আর আগমনী গাইবে, তারাই যারা চিরনবীন, চিরকিশোর—শাশ্বত তরুণ। আর যারা এর ঘাঁটি আগলে রাখবে—হোক না তারা প্রবীণ, হোক না বিজ্ঞ,—কিন্তু সাহিত্যিক তারা আদৌ নয়।

---

# নভেল কেন পড়ি

উপন্যাস, নবন্যাস, কথাসাহিত্য, আখ্যায়িকা যাই কেন বলুন না কোনোটাই আমাদের সাহিত্যে এতটা খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেনি, যাতে আমরা 'নভেল' বললে যা বুঝি তা বোঝাতে পারে। 'কথা সাহিত্য', 'আখ্যায়িকা', এরা সব সমাস-তদ্ধিতের পোষাকে সেজেগুজে এমন বনিয়াদি ঢং-এ অভিধান আলো করে বসে আছে যে দেখলে সহসা মনে হয় এরা বুঝি 'সূর্য সংহিতা', 'আরণ্যক', এদেরই সমশ্রেণীর। এই সব ভেবে চিন্তে আমরা ও সব পোষাকি নাম ছেড়ে দিয়ে ওর ডাক নাম নভেলই আমাদের এ প্রবন্ধে ব্যবহার করব।

'নভেল' বলার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন অসম্ভ্রমে ভরে ওঠে। এটা একরকম সর্ববাদিসম্মত যে 'নভেল' নিতান্তই একটা অবজ্ঞার বিষয়। অনেকের মতে 'নভেল পড়াটা' অত্যন্ত দোষের কাজ। আর যাঁরা নভেল-পড়ায় ততটা দোষ ধরেন না তাঁরাও মনে করেন, ওটা নিতান্তই সময়ের বাজে খরচ আর মস্তিষ্কের অপব্যবহার। এত সব বিজ্ঞ এবং বিরুদ্ধ অভিমত সত্ত্বেও, নভেল-পাঠকের সংখ্যা দিন দিন, আমার বিশ্বাস, বাড়ছে বই কমছে না। সংখ্যা যতই বাড়ছে অবজ্ঞা আর সমালোচনা ততই তীব্র হচ্ছে। সব চেয়ে মজা এই যে যাঁরা খুব নভেল পড়েন তাঁরাও নভেল-পড়ার দোষ দেখাতে

শতমুখ। এমন কি, দুই এক খানি নভেলেও নভেল-পড়ার দোষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেখেছি।

অতদূরই বা যাবার দরকার কি? নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমি দেখেছি—এক একখানা নভেল শেষ হয়, আর মনে হয় 'এইবার একটু কাজের পড়া পড়ব, বাজে পড়া আর না'। কিন্তু এ সংকল্পের প্রথম অংশ প্রায়ই কাজে পরিণত হয় না, আর শেষাংশ ততদিনই ঠিক থাকে যতদিন হাতের কাছে আর একখানা না আসে!

দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে, যা নভেলদ্বারা আকৃষ্ট আর তুষ্ট হয়। আমাদের স্বভাবের সেই যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা আমাদের সৃষ্ট নয়। তার বীজ বাইরের আমদানি নয়, সেটা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতই ঈশ্বরদত্ত। আমাদের মনে একটা সনাতন ইচ্ছা আছে—সেটা হচ্ছে যা জানিনে তা জানবার, যা দেখিনি তা দেখবার, যা নই তা হবার। মানবসভ্যতার যত কিছু উন্নতি, যা কিছু পরিবর্তন, সবারই মূলে এই অনাগতের জন্য প্রয়াস, এই অলব্ধের জন্য লোভ, এই অজানিতের জন্য ঔৎসুক্য রয়েছে। প্রয়াসের সফলতায়, লোভের সার্থকতায়, ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তিতেই ত সুখ—আর সুখই ত মানুষের চরম লক্ষ্য। আমাদের মনের উপরে নভেলের যে দাবি, সেটি তখনই গ্রাহ্য হবে, যখন প্রমাণ হবে যে নভেল অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও আমাদের সেই সুখের তৃষ্ণা মেটায়।

সুচিত্রিত ছবি দেখলে তৃপ্ত হই কেন?—কারণ, সাধনালব্ধ প্রতিভাবলে শিল্পী সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শে পটে যে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন, ওটির জোড়া কলিটি যে আমারই বুকের কোণে অর্ধমুকুলিত অবস্থায় ছিল। আজ সহানুভূতির হিল্লোলে ফুটে, হেসে, নেচে উঠেছে! তাই না আমি আজ এই অনাঘ্রাতের ঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে উঠেছি। শিল্পীর শিল্পে যে আমি আমারই স্বপ্নের সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি। কবির কাব্যে কেন মুগ্ধ হই? কবি যে আত্মনিবেদনের ছলে প্রতিভার মায়াদণ্ডের স্পর্শে আমারই হৃদয়ের নিভৃত কোণের গুপ্তদ্বারের অর্গল খুলে দিয়েছেন। তাই ত আমি আজ নিজের গোপন আলোর ছটায় আত্মহারা। ও আলো যদি আমার মনে না থাকত, তবে কবির মায়াদণ্ডে কেবল রক্তারক্তিই হত। তাঁর ফুৎকারে কেবল ছাই-ই উড়ত। সুকণ্ঠ সঙ্গীতে কেন মুগ্ধ হই? সুরে বাঁধা যে তন্ত্রিটি এতদিন অনাহত, আমার মনের কোণে নিদ্রিত ছিল, আজ গানের সাড়া পেয়ে তালে তালে নেচে উঠেছে। তার উচ্ছ্বাসেই না আজ আমার এ সুখ!

এমনই করে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে সব সুখেরই মূল উৎস আমাদের মনে। আমাদের সামর্থ্য আর সম্ভাবনা অনন্ত। এই সম্ভাবনার আবিষ্কারে সুখ, অনুশীলনে সুখ, সফলতায় সুখ। নভেল আমাদের ভালো লাগে, তার কারণ—তা আমাদের মনের সম্ভাবনার আকাশে ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত, নানান রকমের বিচিত্র ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করে।

আমরা পাঠক-সাধারণ যখন নভেল পড়ি তখন সমালোচকের চোখ নিয়ে পড়ি না; কাজেই একেবারে তন্ময় হয়ে পড়ি। নায়ক-নায়িকার সাথে অভিন্ন হয়ে যাই। তাদের সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি। তাদের বিপদের সম্ভাবনায় আমাদের বুক দুরুদুরু করে, তাদের মিলনে আমরাও মিলনানন্দ পাই। এই যে এতটা প্রাপ্তি, সমালোচক হয়ত বলবেন—এর প্রতিষ্ঠা নিছক মিথ্যার উপরে। তাঁদের এ মত আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারিনে। নভেল মিথ্যা নয়,—অ-সত্য। সত্যের আভাস ওতে পুরামাত্রায় থাকে। তা যদি না থাকত, নভেল যদি কেবল অসম্ভব অস্বাভাবিক, যা-নয়-তাইতে ভরা থাকত তবে কি সমাজে ওর এত প্রভাব, এত প্রতিষ্ঠা হত? আয়নাতে যে মুখ দেখি সেটাও ত সত্য নয়। তাই বলে কি আমরা আয়না ফেলে দিয়েছি? যে সংস্কারের বশে, কারণে-অকারণে, আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াই, নভেল পড়ার প্রবৃত্তি তারই অন্যতর পরিণতি।

আয়নায় আমরা শরীরের প্রতিবিম্ব দেখি, আর নভেলে আমরা আমাদের মনের ছায়া দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেমন দেখায়, সেটি দেখবার সুযোগ আয়নায় পাই। আর বিভিন্ন কার্যকারণের সমাবেশে, ঘাতে-প্রতিঘাতে, মনের অবস্থা কেমন হয়, সেটি অনুধাবন এবং উপভোগ করবার সুযোগ নভেলে প্রচুর আছে। শরীরের পরিবর্তন নিতান্তই সীমাবদ্ধ; কিন্তু মনের লীলা

অসীম। কাজেই নভেলের ভিতর দিয়ে আমাদের দেখবার জিনিস অনন্ত। শরীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া যতটা দরকার, মনের সঙ্গেও তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। শরীরের গঠন আর বল বিধানের জন্য যেমন ব্যায়ামচর্চা দরকার, মানসিক বৃত্তিসকলের স্ফূর্তির জন্যও তেমনই তাদের অনুশীলন আবশ্যক। কিন্তু এই অনুশীলন-ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য নয়। দরকারমত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব সময়ে আমাদের সকলের ভাগ্যে মেলে না। কাজেই হৃদয়বৃত্তির বাস্তব অনুশীলন সব সময়ে এবং সর্বথা সম্ভবপর হয় না। এই অভিযোগের পরেই নভেলের প্রতিষ্ঠা। কাজেই আমরা দেখছি, নভেল একাধারে আমাদের সুখ ও শিক্ষা দুই-ই দেয়।

বর্তমান যুগে নভেলই সর্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সেকালে যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, ভাসান, জারি, কবিগান আদি করে লোকশিক্ষার বিস্তর বাহন ছিল। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা আর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদের সবারই গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হতে চলেছে। আর এদের সবাইকে পিছনে ফেলে দ্রুত গর্বিত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে নভেল। এ কিছু আমাদের দেশে নূতন নয়। জগতের সব দেশেই এই ব্যাপার। সাহিত্য বলতেই আজকাল নাটক-নভেল, গল্প-গাথা এই সবই প্রধানতঃ বোঝায়। আমাদের দেশের কাল আর পাত্র বিবেচনা করলে নভেলের এই দ্রুত প্রতিপত্তি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। আগেকার যাত্রা,

জারি, ও সব ছিল ধর্ম্মমূলক। তখন ধর্ম ছিল সর্ব্বব্যাপী। ধর্ম্মের ভিতর কি যে ছিল আর কি যে ছিল না, তা বলা শক্ত। একলব্যের গুরুপূজা থেকে জন্মেজয়ের সাপমারা পর্যন্ত সবই ছিল ধর্ম্মের অঙ্গ। ধর্মশাস্ত্র আমাদের ইতর-সাধারণের শিক্ষার ভার নিয়ে নিজে অনেকটা অবনত হয়ে পড়েছিল! লোকশিক্ষার জন্য ঐহিক, পারলৌকিক, সাত্ত্বিক, রাজসিক, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি আদর্শ চিত্র করতে করতে আমাদের 'শাস্ত্র'.এক বিরাট জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছিল। পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্র ধর্মমূলক নভেল ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এখনকার নভেলের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে তাতে আধুনিক 'আর্ট' জিনিসটার একান্ত অভাব। এই জন্যই আমাদের নব্য রুচি পুরাণে মোটেই তৃপ্ত হয় না। আমাদের নভেল চাই!

আমার কথায় কেউ যেন না মনে করেন, আমি পুরাণে ভক্তিহীন। ভক্তি আমার কারও চেয়ে কম নয়। পুরাণ-কারগণ চিরদিনই আমাদের নমস্য। লোকশিক্ষার জন্য তাঁদের যে প্রচেষ্টা, তা জগতে অতুলনীয়। সে বিষয়ে আমার সার্টিফিকেট না হলেও তাঁদের চলবে। আর তাঁদের হয়ে এ বিষয়ে ওকালতিও ধৃষ্টতা। আমি কেবল বলতে চাই, তাঁদের যে সেই পুরাকালীন লোকশিক্ষার উপায়, সেটা এখন বাতিল হয়ে গেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য আর বিধেয়ের উপর পুরো ভক্তি রেখেই এ কথা বলা চলে।

এই ধরুন, প্রহ্লাদ-চরিত্র-উপাখ্যানটি আমার খুব ভালো

লাগে। ছেলে-মেয়েদের কাছে সুযোগ পেলেই বলেও থাকি। তার কারণ এর শিক্ষাটি বড়ই সুন্দর। সেটি হচ্ছে এই যে ঈশ্বরে নির্ভর থাকলে বিপদ যতই গুরুতর হোক না কিছুতেই ভক্তকে অভিভূত করতে পারে না। শিক্ষাহিসাবে এর জোড়া পাওয়া ভার। কিন্তু এর আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক নয় আমাদের পক্ষে। যতই ধর্মের ছাপ মারা থাক না, কিছুতেই এ অবিশ্বাসী মনের প্রত্যয় হয় না যে, 'করীর পদ-চাপনে' কেউ প্রাণে বাঁচতে পারে! প্রাণে ত ভালো, পায়ের নখ থেকে চুলের আগা পর্যন্ত কোথাও ত বাঁচবার সম্ভাবনা দেখিনে। তা সে হাতীর বাড়ী গুজরাটেই হোক আর ব্রহ্মদেশেই হোক, বিয়ের শোভাযাত্রায় না হলেই হলো।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। লক্ষ্মণের ঐকান্তিক ভ্রাতৃ-পরায়ণতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য, অতুলনীয় বীরত্ব এ সবই কবি লোক-শিক্ষার জন্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, এমন কি অত্যুক্তিরও। সে সীমা ছাড়ালে সহানুভূতি আর আসে না। হোক না সেটা ত্রেতা যুগ, আহারের প্রথা যখন সেকালে প্রচলিত ছিল, সে অবস্থায় লক্ষ্মণ কি করে চৌদ্দটা বছর না খেয়ে রইলেন?

যাক, খোলা দরজায় আর বার বার ঘা দিয়ে কি হবে! মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষার গুণেই বলুন আর দোষেই বলুন, আমাদের বুদ্ধির ছিদ্র সেকালের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। কাজেই সেকালের শাস্ত্রের অত

মোটা সূতা কিছুতেই আর আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করতে পারে না। সেকালের গ্রন্থসকল যতই শিক্ষাপ্রদ আর হিতকারী হোক না, একালের আমাদের কাছে তা মোটেই মনোহারী নয়। স্বাভাবিকতার নিতান্তই তাতে অভাব। সেকালের নায়ক-নায়িকারা মোটেই আমাদের ধাতের নয়। আমরা চাই,—নায়ক-নায়িকা, যারা আমাদের মত রক্তমাংসে গঠিত, যারা আমাদের মত ভুল-ভ্রান্তির অনতীত, আমাদেরই মত সুখ-দুঃখের অধীন।

নভেলই হচ্ছে বর্তমান যুগের পুরাণ। আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত আর জাতিগত রীতিনীতির সমালোচনা ও সংস্কার এখন নভেলের মধ্যে দিয়েই হচ্ছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাধনা ও লক্ষ্য একালে অনেকাংশে নভেলদ্বারাই নির্দিষ্ট আর প্রচারিত হচ্ছে। নভেলের একটা খুব বড় কাজ এই যে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষিত সমাজের মনকে জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে বেঁধে এনে, ধীরে ধীরে এক বিরাট বিশ্বমানবের মণ্ডলীতে পরিণত করতে চলেছে। জাতীয় চিন্তা নভেলের ভিতর দিয়ে প্রতিস্থত হয়ে, তার সমস্ত বিশেষত্বগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে, সভ্য জগতের সামনে ধরছে। কাজেই, দেখে শুনে ঠেকে সবাই নিজ নিজ জাতীয় আদর্শ গড়ে পিটে নেবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যের অন্তঃসলিল স্রোতে সমাজের বহুকালের সঞ্চিত স্তূপীকৃত আবর্জনারাশির নীচে অনেক জায়গায় অলক্ষিতে ভাঙ্গন ধরেছে। এমনই করে শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে

নভেল সতত সমাজের সংস্কার সাধনে নিরত রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে ভালো নভেল পড়া মানেই নিজের মনকে সৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে অনুপ্রাণিত করা, অসৎ বিষয়ে বিতৃষ্ণ করা।

অবশ্য একথা স্বীকার আমাকে করতেই হবে যে, সব নভেল কিছু নভেলের মর্যাদা রক্ষা করে চলে না। সব নভেল নভেলের উচ্চতর আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছাতেও পারে না। কিন্তু তাতে কি? ঠিক যেমনটি চাই, তেমনটি ত আমরা অনেক জিনিসই পাইনে। তাই বলে কি যা পাই, তা ফেলে দিই? না, যা পাইনে, তা আর চাইনে, খুঁজিনে! নভেল যদি কখনও আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার দেওয়া দুঃখ বা নৈরাশ্য নিতে আপত্তি করলে চলবে না; অতিরিক্ত অসহিষ্ণু হলে তার পরে অন্যায় করা হবে।

বর্তমান কালটাকে খুব হাতের কাছে, চোখের সামনে, পাই বলে অনেক সময়ই আমরা তার পরে অবিচার করে থাকি। এমন কি যেটা তার প্রাপ্য সেটাও তাকে দেওয়া অনেক সময়ে বাহুল্য, অনাবশ্যক, মনে করি। মনে করি, তা হলে বুঝি তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত অযত্নে কোনো জিনিসই বাড়ে না। আর অনাদরে, অশ্রদ্ধায় ভালো জিনিসও আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যায়। কৃতবিদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অনেক সময় নভেল-পড়াটাকে নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে করেন; তার ফলে, নভেলের একটা ঝোঁক হয়েছে বালক-বালিকা-পাঠ্য হয়ে পড়বার দিকে। শিক্ষার

বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নভেলের পাঠক-সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে; কিন্তু বিস্তৃতির তুলনায় তার গভীরতা বাড়ছে না। কাজেই, লেখক যখন নভেল লেখেন তখন তাঁর সামনে থাকে ভাবপ্রবণ, উৎসুক এক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়। তাদের মনোরঞ্জন আর শিক্ষাবিধানই হয় তাঁর কাজ। এ ক্ষেত্রে নভেলের উচ্চতম আদর্শের পরিণতির সম্ভাবনা কোথায়? পুঁটুলে বড়শি আর ছিটে কঞ্চির ছিপে রুই মাছের আশা করা কি সঙ্গত হবে? তবে, রুই মাছের কপালে নেহাৎ মরণ লেখা থাকলে পাড়ে লাফিয়ে উঠেও ধরা দেয়;—সে কথা স্বতন্ত্র। কাজেই নভেল আশানুরূপ হচ্ছে না বলে বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের পক্ষে এর প্রতি একেবারে বিমুখ হওয়া মোটেই উচিত নয়। আর আমরা, যারা নভেল পড়ি, আর কিছুই করিনে, আমাদেরও লজ্জিত হবার বিশেষ কারণ দেখি না। আমরা অন্ততঃ তাদের চেয়ে ভালো, যারা নভেলও পড়ে না, আর কিছুও করে না।

---

# নতুন কিছু

নূতনকে জানবার জন্য, তাকে পাবার জন্য, মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহ যতই থাক না, তার পরে সন্দেহ আর বিদ্বেষও নেহাৎ অল্প নয়। ইতর প্রাণিকে খাবার আগে শুঁকে দেখবার প্রবৃত্তি যিনি দিয়েছেন মানুষের মনের বিচারবুদ্ধিও তাঁরই দান। কাজেই এর অনুশীলন মানে তাঁর ইচ্ছারই অনুসরণ। কিন্তু, আমরা যে আমাদের বোকামি আর গোঁড়ামি দিয়ে আমাদের সহজবুদ্ধিকে কত রকমে, কত বেশি অভিভূত আর বিকৃত করে তুলতে পারি তার আর অন্ত নেই।

আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় নতুন কিছু কানে উঠলেই কারও আসে গায়ে জ্বর, কারও হয় প্রাণে আতঙ্ক, কারও ওষ্ঠপ্রান্তে ফোটে বিদ্রূপের হাসি; আর অধিকাংশেরই তা মনে ধরে না। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই ভাবগুলো নিতান্ত সাত্ত্বিক না হলেও একান্ত অহৈতুক তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের জাতীয় জড়তার সাথে সাথে সামাজিক মনও ধীরে ধীরে অনেকটা অসাড় এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, প্রয়াস ও প্রযত্ন আদি করে সুস্থ ও সবল প্রাণের যত ভাব ও বৃত্তি তারা সব অবসর নিচ্ছে। আর সন্দেহ ও অবজ্ঞা, নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্য তাদের স্থান পূরণ করছে। এমনই করে, যেটা স্বতঃসিদ্ধ

সেইটেতেই আমাদের দাঁড়িয়ে গেছে ঘোরতর সন্দেহ—আর যেটিতে বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে, সে বিষয়ে আমরা হয়ে পড়েছি একেবারে উদাসীন।

সৎ-অসৎ বেছে নেবার ধৈর্য ও উদারতা আমরা ঠিক যে পরিমাণে হারিয়েছি, সন্দেহ ও অবজ্ঞা করার কার্পণ্যও ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের পেয়ে বসেছে। আগুন নিবে গেলে ধোঁয়ার ভাগটা স্বভাবতই অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় যতই ভাটা পড়ছে, মনের আগুনের উত্তেজনা যতই কমে আসছে—আমাদের মনোজগতে বিধির চেয়ে নিষেধের মাত্রাও ততই প্রচুরতর হচ্ছে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, বেশির ভাগ নিষেধের মূলেই রয়েছে আমাদের কর্মবৈমুখ্য। এ বিষয়ে আমাদের জোড়া মেলে না। এ রোগের বীজ এ দেশের জল-হাওয়ার ভিতরে এমনই নির্ভাজে মিশে গিয়েছে যে,—রোগটাই এখন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আর রোগমুক্ত অবস্থা যেটা, সে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা নতুন কিছু।

মাঝে মাঝে, স্থানে-অস্থানে আমরা আমাদের রক্ষণশীলতার বড়াই করে থাকি। নানা বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে এসেও নাকি আমরা আমাদের জাতিগত বিশিষ্টতা হারাইনি। কিন্তু আমাদের সেই বিশিষ্টতাটা যে কি বস্তু, সেটা হাজারে এক জনও পরিষ্কার করে বলে দিতে পারেন না। আর, সেটি বজায় থাকাতে আমাদের বর্তমানেই বা কি সুবিধা হচ্ছে, আর

আখেরেই বা কি সুসার হবার আশা আছে, সে সব বিবেচনা করার মত বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনেকেরই নেই। এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে ? বস্তুটা যে কোথায়, কি অবস্থায়, তা জানিনে তবু তার অস্তিত্বের গুজবেই বিভোর, ভাববার ধৈর্য আমাদের একটুও নেই, অহঙ্কারের তমো প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রাতেই রয়েছে। জাতীয় বিশিষ্টতা বলে যদি সত্যিই কিছু আমাদের থাকে তবে তা নিজের গুণেই রয়েছে। আমাদের তরফ থেকে তাকে রাখবার জন্যে জাতিগত ভাবে খুব বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির প্রতি অণুতে যে জিনিস আমাদের অন্তরস্থ এবং মজ্জাগত হয়েছে তা কি অত সহজে যাবার! যা যাবার নয় তা রেখেছি বলে বাহাদুরি নেওয়া তখনই সম্ভব যখন নতুন কিছু গড়বার, ঘরে আনবার, বা, যা ছিল তাকে পরিপুষ্ট করবার আশা সুদূরপরাহত।

রক্ষণশীলতার সাথে যদি প্রসারপরায়ণতা না থাকে, তবে তা জাতীয় জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাততুল্য। জাতীয় জীবনের ধারাকে জমিয়ে বরফ করে রাখায় কোনই লাভ নেই। তার লক্ষ্য অব্যাহত রেখে, তার প্রণালীর প্রসারসাধনই বাঞ্ছনীয়।

আমরা রক্ষণশীলতা বলতে যে বস্তুকে বুঝি, যার অজুহাতে আমরা সকল রকম সংস্কারের পরেই খড়্গহস্ত, তার কতকটা হচ্ছে তারই পরিবর্ধিত এবং বিশিষ্ট সংস্করণ, যার বশীভূত হয়ে আমরা শীতের দিনে পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গলেও আটটার আগে

উঠিনে। আমরা আমাদের মনের সব বিভাগেই দিব্যি রবিবারের মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছি। এর মধ্যে যদি কেউ এসে হঠাৎ সোমবারের দাবি করে—তা হলেই মুসকিল! চাকভাঙ্গা মৌমাছির পাল্লায় পড়ে সে ব্যক্তির যে অবস্থা হয় সেটা খুব জমকালো হলেও মোটেই সুখের নয়। তবে ভরসা এই যে, আমরা ভন ভনই করি—হুল ফুটাইনে;—কারণ ও বস্তু আমাদের নেই। আর তার কারণ, আমরা যারা বেশীর ভাগ ভন ভন করি, তারা কোনো দিনই মধু চয়ন করিনি! চয়নের যোগ্যতা যাদের নেই, রক্ষণের ক্ষমতা তাদের দেওয়া প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত বাজে খরচ হত।

আমাদের মনের যে রক্ষণশীলতা, তার নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে। আর, শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে তার তারতম্যও আশা করা যায়। কাজেই, একজনের কাছে যা সহজ, অপরের কাছে তা বাড়াবাড়ি; একজনের কাছে যা স্বাভাবিক, অপরের কাছে তা জবরদস্তি বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। তবে, আজ যা নতুন, দু দিন বাদে তাই সেকেলে হয়ে দাঁড়াবে হয়ত। অন্ততঃ, আজ আমরা যে সব জিনিস বিনা তর্কে, সেকেলে বলে গ্রহণ করছি, এটা নিশ্চিত সত্য যে, এক কালে তাও নতুন ছিল।

আমাদের মনের দুয়ারে উমেদারি করে বলে নতুনের 'মানহানির' আশঙ্কা থাকলেও তার গুণহানির কোনই সম্ভাবনা নেই। কাজেই কেবল নতুন বলেই বেশি দিন কোনো জিনিস

অবজ্ঞাত থাকে না। গুণগ্রাহী লোকে একদিন না একদিন তাকে গ্রহণ করে নেবেই, যদি তার ভিতরে গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে। আর জনসাধারণ চিরদিনই গতানুগতিক।

যত কিছু রীতিনীতি, বিধিনিষেধ সমাজে প্রচলিত হয়েছে, সবারই এক ইতিহাস। বিনা বাধায়, অনায়াসে কিছুই গ্রাহ্য হয় নাই। যা সত্য, বাধায় তার বেগ বাড়ে, আঘাতে তার ফুলকি ছোটে, বিদ্রূপে তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। মানবমনের রক্ষণশীলতার আগুনে পুড়ে ছাই না হয়ে, বরং খাঁটি হয়ে যা বেরিয়ে আসে, তাই হবে গ্রহণযোগ্য, তাই হবে ধারণযোগ্য।

এই হিসাবে রক্ষণশীলতার মূল্য আছে। হিরণ্যকশিপু অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ষণশীল হয়েছিল বলেই নরহরি অবতার। রাবণের অতো জেদ না থাকলে রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ডেই শেষ হত। অন্ততঃ লঙ্কাকাণ্ডটা হত না। আর তাতে করে শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বের দাবি মোটেই জন্মাত না! ভীষ্ম-দ্রোণের মত মহারথিরা যদি অতটা রক্ষণশীল না হয়ে, পাণ্ডবদের দাবিটাও একটু বুঝে দেখতেন তা হলে কুরুক্ষেত্রের মহোৎসবটা ঘটত না! আর তাতে করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত জগন্মান্য দর্শন-গ্রন্থ আমরা পেতাম না। পূর্ণাবতারের অবতারত্ব ব্রজলীলাতেই পর্যবসিত হইত। চাঁদ সদাগর না থাকলে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার হত না। সেকালের কথা যাক; এ যুগেও দেখুন না,—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পত্তনের মূলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা, আবার তার বর্তমান ঐক্য এবং উন্নতির

মূলেও সেই অন্তর্বিপ্লব, যার কারণ তার দক্ষিণাংশের রক্ষণশীলতা।

একটু ভেবে দেখলেই এদের সঙ্গে আমাদের তথাকথিত রক্ষণশীলতার একটা বিষম অনৈক্য ধরা পড়ে। এরা প্রাণের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে, তুহাত দিয়ে ঠেলতে জানে! আমরা নিষ্ক্রিয়, এরা উদ্দাম। আমরা চাই চাপা দিতে, ওরা বলে, 'হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার'। আমরা যা বলি সেটা মুখের কথা, তারা যেটা বলে গেছে সেটা তাদের প্রাণের অভিব্যক্তি। এই সব কারণেই প্রকৃত রক্ষণশীলতা হয়েছে চিরকালই ভালো-মন্দর কষ্টিপাথর। সমাজে যা কিছু রীতিনীতি প্রচারিত হয়েছে, তারা সবাই এর পরে নিজ নিজ টিপসই এঁকে দিয়ে, আপনাকে প্রমাণ করে, তবে মান্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের রক্ষণশীলতা ত ও শ্রেণীর নয়! তা হচ্ছে অনেক স্থানেই আমাদের কর্ম-বিমুখ মনের সুনিপুণ ছদ্মবেশ। কাজেই এ দিয়ে কষ্টিপাথরের কাজ চলতে পারে না। ভেড়ার শিং-এ হীরার ধার পরীক্ষার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

সংস্কার বলে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া খারাপ বটে, কিন্তু রক্ষণশীলতার নামে জড়তার আশ্রয় নেওয়া আরও খারাপ বলেই মনে হয়। জগাই-মাধাই-এর কাছে সত্যের প্রকাশ অসম্ভব নয়; কিন্তু ইট-পাটকেলের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া অস্বাভাবিক। উচ্ছৃঙ্খলের কার্যকলাপ বিশৃঙ্খল হলেও তার মনপ্রাণ ত শৃঙ্খলমুক্ত বটে!

যে যুগে আমরা জন্মেছি, এ যুগে রক্ষণশীলতার অর্থ পুরাতনের পরে অন্ধ বিশ্বাস নয়। আর 'নাই মামা' এবং 'কানা মামা'র মধ্যে কোনটি যে বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্টই অবসর আছে।

এ উন্নতির যুগে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থানই নাই। স্থবিরত্ব, নির্বাণ, স্থাণুত্ব আদি করে সব পরিণতি আধ্যাত্মিক জীবনে খুব লোভনীয় জিনিস, সন্দেহ নেই; কিন্তু সামাজিক হিসেবে এ সব মান্য-গণ্য হলেও, মোটেই বরেণ্য নয়। পণ্ডিতেরা বলেন—আমাদের বাইরেটার সঙ্গে নাকি ভিতরটার একটা শতরঞ্জের বাজি চলেছে। বাইরের কিস্তি সামলাতে ভিতরেও যে ওঠা-নামা, ভাঙ্গা-গড়া চলছে, তাই নিয়েই নাকি আমাদের জীবন। এ ওঠা-নামা যেদিন বন্ধ করব, ভবের পাত-তাড়িও সেদিন আমাদের গোটাতে হবে।

প্রাণের বেলায় যে কথা খাটে, মনের বেলায়ও, আমার বিশ্বাস, তা খাটবে। মনোজগতে যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, তবে ওঠা-নামা, ভাঙ্গা-গড়ার জন্যে সর্বদা তৈরি থাকতে হবে। দেখে, শুনে, ঠেকে, আমাদের শিখতেই হবে। সনাতনের দোহাই দিয়ে নূতনকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে যতই উপকারী হোক না, যতদিন পর্যন্ত উচিত, তার চাইতে বেশি দিন তার জের টানলে, মা ও শিশু দুজনের পক্ষেই তা অপকারী হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের শিক্ষায়, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের চিন্তায়,

আমাদের অনুষ্ঠানে, আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, সর্বত্র আমাদের ঝোঁক এবং জেদ হয়েছে এমনই ধারা পুরাতনের জের টানবার দিকে। আমাদের বুদ্ধি আমরা নিযুক্ত করছি নূতনকে নাজেহাল করবার জন্য; আমাদের বিদ্যা আমরা জাহির করছি পুরাতনের পক্ষে সাফাই গেয়ে। এতে করে আমাদের ওকালতি বুদ্ধি মার্জিত হলেও, আন্তরিকতা ক্রমেই কমে আসছে। পুরাতনের সহস্র ত্রুটি আমরা অহরহ দেখছি, অথচ নূতনের গুণরাজি আমরা কল্পনার কালিতে ঢাকছি। যা আমাদের মনে নেই, তাই আমরা মুখে গাচ্ছি। আর, যা আমরা মুখে সাধছি, তা কাজে করছিনে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোজগতের এই সব গোলমালের একটা প্রতিক্রিয়া আছে, আমাদের জাতীয় জীবনের পরে। মনে হয়, তার ফলেই, আমাদের দেশব্যাপী আন্দোলন পরিণত হয় হুজুগে, আর অনুষ্ঠান পর্যবসিত হয় আস্ফালনে!

বর্তমান যুগে রক্ষণশীলতার মানে,—পুরাতনের জায়গায় নতুন কিছু আনবার আগে তাকে বেশ করে বাজিয়ে নেওয়া; পুরাতনের তুলনায় তার উপযোগিতা বেশি কিনা বিচার করা। এ কাজ করতে হলে উন্নতি-প্রয়াসি-মাত্রেরই উচিত বিচারবুদ্ধিকে যথাশক্তি শাণিত রাখা, আর মনটাকে একেবারে নিরপেক্ষ রাখা। নূতন-পুরাতনের পরীক্ষায় আগে ভাগেই পুরাতনের গায়ে পাশের মার্কা মেরে দিলে চলবে না। নূতনের বিচারক হলেও এটা আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, সে

আমাদের সামনে যে জায়গাটায় দাঁড়ায় সেটা আসামীর কাঠগড়া নয়—বিচারপ্রার্থীর আসন। তাকে সম্মান না দিতে পারি, কিন্তু অশ্রদ্ধা করবার অধিকার আমাদের নাই। আর, তাকে অবজ্ঞা করলে, নিতান্তই তার পরে অবিচার করা হবে। এমনই করেই এখন আমরা বিচারকের আসন কলঙ্কিত করছি।

ব্রত-অনুষ্ঠান করতে হলে যেমন শাস্ত্রমতে সংযমপালন করে ধর্মবুদ্ধির উদ্বোধন করতে হয়, নতুনের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণের সময়েও তেমনই মনটাকে যথাসম্ভব সংস্কারবর্জিত করে সত্যের জন্যে একাগ্র করে তুলতে হবে। তা হলেই সত্য আমাদের লাভ হবে। যা মিথ্যা তা আপনা হতেই দূরে সরে যাবে। চুম্বক লোহাকেই টানবে; ছাই-পাঁশ সব যেখানকার সেখানেই পড়ে থাকবে। কিন্তু মন যদি আমাদের গোড়া থেকেই ছাই-পাঁশে ভরা থাকে, সেখানে যদি সত্যের জন্যে এতটুকুও ঔৎসুক্য, কণামাত্রও জিজ্ঞাসা না জাগে, তা হলে আর আমাদের আশা কোথায়? কাঠের ঘোড়া কখনও জল খাবে কি? কাঠের ঘোড়ার পক্ষে জলপান যতটা অসম্ভব, সত্যিকারের রক্তমাংসের ঘোড়ারও যদি গরজ না থাকে বা মরজি না হয়, তবে তাকে জল খাওয়ানো তার চেয়ে কোনো অংশেই কম অসম্ভব নয়। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে ডেকে তোলা বরং সোজা, কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে ওঠানো বড়ই শক্ত।

এখন আমরা জেগে ঘুমোচ্ছি। পুরাতনের অনুপযোগিতা

আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝেছি। তার পরে বিতৃষ্ণ এবং বিরক্ত আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছি ; কিন্তু তবুও নতুনকে সর্বান্তঃকরণে আবাহন, গ্রহণ এবং আলিঙ্গন করবার সাহস ও উত্তেজনা আমরা পাচ্ছিনে। আর আমাদের এই দৈন্য, এই হীনতা আমরা ঢাকছি রক্ষণশীলতার আবরণ দিয়ে। কিন্তু এ আবরণটা যে কত পাতলা, কত শতচ্ছিদ্র তা আমরা দেখেও দেখছিনে। রক্ষণশীলতার গোঁ আমাদের মোটেই নেই। আমাদের সমাজজোড়া, দেশজোড়া আছে ঘোর তামসিকতা। কোথায় আমরা রক্ষণশীল? সর্বত্রই ত আমরা অতিমাত্রায় অনুকরণপ্রিয়। সর্বদাই ত আমরা রাম-রহিমে মিলিয়ে একটা খিচুড়ি পাকিয়ে, নিজের নিজের জান বাঁচিয়ে দিন গুজরানেরই পক্ষপাতী। কেবল, যেখানেই আমাদের গায়ে আঁচড় লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানেই আমাদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা হয়েছে, সেইখানেই আমরা রক্ষণশীল বনে গিয়েছি। (যখন রক্ষা করবার জিনিস আমাদের প্রচুর ছিল, তখন আমরা হয়ে পড়েছিলাম বিশ্বপ্রেমিক ; আর এখন, যখন আমাদের সবই চাই,—আমরা হয়েছি রক্ষণশীল। আমাদের সেই বিশ্বপ্রেম আর এই রক্ষণশীলতা দুই-ই হচ্ছে একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ।)

অতিরিক্ত বিশ্বপ্রেমের বন্যায় নিজের জাতীয়তা ভাসিয়ে দেওয়া, কিংবা জাতীয়-মনের দুয়ার বন্ধ করে তার সামনে রক্ষণশীলতার পাহারা বসানো, দুই-ই জাতির পক্ষে সমান

অকল্যাণ। এ দুটো দোষই আমরা সমান আয়ত্ত করে নিয়েছি। আপাততঃ তাতে করে আমাদের সুবিধে হয়েছে এই যে কারও কাছেই আমাদের ঠকতে হয় না। যখনই কেউ আমাদের জাতীয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তখনই আমরা সাজি বিশ্বপ্রেমিক; আর যখনই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে কথা ওঠে, তখনই আমরা হই রক্ষণশীল। বাতাস পেলে আমরা পাল তুলি, আবার দরকার হলে গুণেও নামি, কিন্তু নৌকা আর আমাদের এগোয় না। কারণ বাঁধনটার পরে আমাদের অসম্ভব মায়া। সেটা কাটতে আমাদের বড়ই বাজে!

নতুন-কিছুর পরে আমরা বিষম চটা; কারণ, তা আমাদের এই বাঁধনটাকে আচমকা এসে টান মারে, খামখা এসে ছুরি চালায়। আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের বর্তমান অবস্থায় নতুনের সব চেয়ে বড় উপযোগিতাই হচ্ছে ঐখানে। হতে পারে,—নতুন আমাদের কাছে যে আবদার করে সেটা অন্যায়, তার পরিপূরণে আমরা অশক্ত; কিন্তু তবু যে তা আমাদের ন্যায়-অন্যায়-বোধটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলে, আমাদের শক্তিটাকে ঝাঁকি দিয়ে খাড়া করবার চেষ্টা করে সেটাও বড় কম লাভ নয়। এবং কেবল মাত্র এই জন্যই তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা আমাদের পোষণ করা উচিত।

---

# স্বামী-স্ত্রী

শাস্ত্র আর দেশাচারের সমবেত চেষ্টা এবং নিশ্চেষ্টতার ফলে আমাদের সমাজের স্ত্রী-জাতির গতি ও পরিণতি যে ধারা অনুসরণ করে চলেছে তাতে আমরা সবাই খুব খুসী, এবং ঘরে বাইরে তা নিয়ে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট গর্ব প্রকাশ করতেও অল্পবিস্তর ব্যগ্র। ব্যাপারটাকে তর্কের অতীত করে পদ্যের ছাঁদে বেঁধে আমরা বলে থাকি—'রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা, কোথা দিতে তাদের তুলনা !'—উপরের চরণের 'রূপবতী' কথাটাকে চ-বৈ-তু-হির দলে ছেড়ে দিলে আশা করি কারও বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা নেই। আর তা হলে বাকি যা রইল তার মানে দাঁড়াল এই যে সাধুতা আর সতীত্বে ভারত-ললনা জগতে অতুলনীয়। কিছু দিন আগেও যে দেশে ধরে বেঁধে 'সতী' করবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে দেশের পক্ষে এমন ধারা দাবি একেবারে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পাতিব্রত্য যে হিন্দু-রমণীর একটা জাতিগত সংস্কার এবং জন্মগত উত্তরাধিকার, সে কথা মেনে নিয়েই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

তবে, এ সব বিষয়ে আমাদের সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের তুলনা অনেকটা বকের বাড়ীতে শেয়ালের নিমন্ত্রণের মতই অশোভন ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমাদের

ভূতপূর্ব শাস্ত্রকারগণের অতিমাত্র শৃঙ্খলাপ্রিয়তার ফলে সমাজে স্ত্রীজাতির পক্ষে কার্যতঃ যে লক্ষ্য এবং সাধনা সেকালে নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা বহুকাল ধরে আমাদের সনাতন জড়তার ভিতর দিয়ে পরিস্রুত হয়ে এখন যে আকার লাভ করেছে সেটা অপর সকল সভ্যসমাজ থেকে ভিন্ন রকমের।

সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো মনে করে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রীজাতিকে 'স্ত্রী'র জাতিতে পরিণত করেছি। স্ত্রীত্বেই তাদের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ! বর্ণমালার অনুস্বর-বিসর্গের মত সদাই তারা আশ্রয়-স্থান-ভাগী; কোনো রকম স্বাতন্ত্র্যই তাদের প্রাপ্য ও গ্রাহ্য নয়। একথা নানান রকমে তাদের শুনিয়েছি, পড়িয়েছি—শিখিয়েছি, বুঝিয়েছি। আমাদের স্ত্রীজাতিকে আমরা দেখি—বর্তমান আর ভবিষ্যতের পুরুষ-জাতির মধ্যে যোজকের মত। ব্যাপারটাকে তর্কের সময় যতই আমরা আধ্যাত্মিক আভায় এবং সামাজিক সম্ভ্রমে ভূষিত করি না কেন, সে গৌরব অনুভব ও উপভোগ করবার মত মার্জনা এবং স্বাধীনতা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির থাকে না।

শিশুকালে বর্ণ-সংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কণ্ঠস্থ করি—'স্বামী পরম গুরু', 'বন্ধ্যা নারীর আদর নাই'। এ রকম সব দাম্পত্য এবং পারিবারিক সত্য ও সিদ্ধান্ত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে শিশুহৃদয়ে মুদ্রিত করবার প্রথা আর কোনো দেশেই নেই। তার পর শৈশব অতিক্রম করতে

না করতেই রূপকথা, ব্রতকথা ও উপকথার উপদ্রবে নারী-জীবনের গণ্ডি ক্রমশ আমাদের কাছে সংহত এবং সুনির্দিষ্ট হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রশ্নেরও পূর্ণ সমাধি হয় 'হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা' দিয়ে।

এমনই করে নারীজাতির মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আমরা স্ত্রীত্বের বনিয়াদ পাকা করি। এ যেন প্রাণ দিয়ে চোখ বাঁচানো! পাতিব্রত্য অতি উপাদেয় পদার্থ তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মনুষ্যত্ব তার চেয়ে ঢের বেশী মহার্ঘ। যে স্ত্রীত্বের মূলে রয়েছে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব,—যা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়োগুণে স্ত্রীহৃদয়ে স্বভাবতই ফুটে ওঠে নি,—পারিপার্শ্বিক প্রেরণা এবং অপ্রাকৃত উত্তেজনার ফলে গোটা মনুষ্যত্বই যেখানে বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়েছে, সেখানে তা নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো বুদ্ধিমানের কাজ বলে ত মনে হয় না। তরকারী হিসেবে বাঁধা কপি উপাদেয় হলেও গাছ হিসেবে সে যে অতি বি-শ্রী।

আমাদের সমাজের আত্মবিস্মৃত স্ত্রীজাতির এই তথাকথিত পাতিব্রত্যে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের কোনো মহৎ কল্যাণই সাধিত হবার সম্ভাবনা নেই। অভিজ্ঞতার উপরে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, ঘাতপ্রতিঘাতে যার মেরুদণ্ড শক্ত হবার অবসর পায়নি, প্রতি পদে শাস্ত্র আর দেশাচারের উপর ভর দিয়েই তার জান বাঁচাতে হবে। নিজের চোখ যার ফুটতে

পায়নি, শাস্ত্রের চোখে দেশাচারের চশমা এঁটেই তাকে সব দেখতে হবে। রজ্জুকেও তার সর্পজ্ঞান করে তফাৎ থাকতে হবে—নইলে সর্পে রজ্জুভ্রম হবার আশঙ্কা! দুগ্ধপোষ্য মামা-শ্বশুরকে দেখলে ঘোমটার আয়তন তার বাড়াতে হবে, আর বাপের বয়সী ভাশুরের ছায়া স্পর্শ করলে তেরাত্র তাকে 'উপবাস' থাকতে হবে—এই তার পক্ষে বিধি।

নন্দলাল বহুকষ্টে কিছুদিন তার ভীষণ পণ রক্ষা করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার ষাঁড়া নিশ্চয়ই আর বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি। আমাদের দেশের স্ত্রীসমাজও শাস্ত্র আর দেশাচারের কলকৌশলে মরে বেঁচে পত্নীত্ব বাঁচিয়ে চলে বটে, কিন্তু তাতে 'পতিনারায়ণ' ছাড়া আর কোনো দেবতাই প্রসন্ন হন না। 'পতিনারায়ণ'কে অযথা অবজ্ঞা করতে আমি বলিনে, কিন্তু তাঁর মোহে 'সত্যনারায়ণের' প্রসাদ উপেক্ষা করলে, বিনি তুফানেও ঘাটে এসে ভরাডুবি হয় সে কথা ত 'পাঁচালি'তেই লেখা রয়েছে। সাধারণভাবে সেই কথাটার আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২

দাম্পত্য দায়িত্বে যে কর্ত্তব্য-বিভাগ সাধারণতঃ আমাদের সমাজে দেখা যায়, সেটা কি সমাজতত্ত্ব, কি মনস্তত্ত্ব কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা চলে না। নিরুপায় স্ত্রীর স্কন্ধে সমস্ত নৈতিক দায়িত্বটা নিঃশেষে চাপিয়ে স্বামীর হাতে দেওয়া হয়েছে

আর্থিক দায়িত্ব, আর সার্বভৌমিক অধিকার। আমাদের সমাজে স্বামীদের নৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান নেই, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে তার অনুশীলন এবং সম্পাদন হচ্ছে স্বামীর খুসী অর্থাৎ optional, এই কথাই আমি বিশেষ করে বলতে চাই। এ কথা আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও বলা চলে। স্বামী উপার্জনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে সমাজে কিছুই বলার থাকে না। স্ত্রীর ত থাকতেই নেই সে কথায়! খেয়াল হলেই স্বামী সংসার ত্যাগ করে কোনো 'আশ্রম' বা 'আড্ডায়' ভিড়ে যেতে পারেন। আর, তাতে সমাজের বাহবাও অনেক স্থলে তাঁর জুটে থাকে। কিন্তু স্ত্রীর বেলায় পান থেকে চুনটুকু খসলেই প্রলয়। যে পথের কথা তার কাছে বাৎলে দেওয়া হয়েছে, তা কাদাজলে যতই পিছল, আর কাঁটাবনে যতই দুর্গম হোক না, প্রাণের দায়ে, তা থেকে একটু এদিক ওদিক হলেই তাকে যেতে হবে একেবারে রসাতল!

জামাতা বাবাজীকে আশীর্বচন লিখতে আমরা 'নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু'র চাইতে বেশি কিছু লেখা বাহুল্য এবং অনাবশ্যক মনে করি; কিন্তু বধূমাতার বেলায় 'সাবিত্রী সমতুল্যাসু'র কমে কিছুতেই চলে না। কেবল আশীর্বচন লিখবার বেলাতেই যে এমনধারা পক্ষপাত, তা নয়; দুর্বচন-প্রয়োগের সময়েও আদান-প্রদানটা এই অনুপাতেই হয়ে থাকে। সেকালে নাকি যে পাপে শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা হতো ঠিক সেই পাপের দরুণই ব্রাহ্মণের নামমাত্র অর্থদণ্ডই যথেষ্ট

বিবেচিত হতো! একালে আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক দণ্ডও এই আইনেরই ধারা অনুসরণ করে চলে। সাদা এবং স্বল্প কথায় বলতে গেলে—আমাদের সমাজে স্বামীর অপরাধের দণ্ড নাই, আর স্ত্রীর দোষের মার্জনা নাই। শুধু তাই নয়; অনেক সময় স্বামীর দোষে স্ত্রীই অবমানিত হয়। স্বামীস্ত্রীতে একাত্মবোধ আর কোনো সমাজেই এতটা ঘনীভূত হতে পারেনি—একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে!

সত্যবানের মত যজ্ঞনিষ্ঠ, অথবা পুণ্যশ্লোক নলের মত সত্যব্রত না হয়েই আমরা সাবিত্রী-দময়ন্তীর কামনা করে থাকি। কাজেই শাস্ত্রে যে বলে, কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি, তার প্রমাণ আমরা অহরহই ঘরে ঘরে দেখতে পাই। হরধনু-ভঙ্গের শক্তি অনেক কাল হলই অন্তর্হিত হয়েছে সমাজ থেকে, কিন্তু সীতালাভের সখ পুরামাত্রাতেই বর্তমান। সখের নেশায় আমরা একেবারেই ভুলে যাই যে এ ঘোর কলিতে ভুঁই ফুঁড়ে সীতার আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই। আর, তা থাকলেও, তাঁকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করবার মত জনক কোথায়? ত্রেতায় যখন সমাজে ত্রিপাদ পুণ্য আর একপাদ মাত্র পাপ ছিল, তখনও জনক মাত্র একজনই জন্মেছিলেন। আর, এখন এই ঘোর কলিতে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীকে মিথিলাপুরী বলে অনুমান করে বসি, তা হলে বাকি সবও উক্তরূপ অনুমান দিয়েই উপভোগ করতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে চাইলেই নেশার স্বপন ছুটে যাবে!

মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য সহজ, সার্থক এবং কল্যাণকর করতে হলে স্বামীর মনুষ্যত্ব আগে জাগাতে হবে। সংযম এবং শিক্ষার অভাবে যেখানে পুরুষ ক্রমেই অপাত্রে পরিণত হচ্ছে, সেখানে স্ত্রীজাতির উপর কেবল কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করলে কেবল তাদের মনুষ্যত্বই পঙ্গু হবে; আর সমাজের ঘরের আবর্জনা আঙ্গিনায় এসে জড়ো হবে।

স্ত্রীকে দেবী করে তুলবার জন্যে আমাদের সমাজে যেমন-ধারা ধরাধরি, বাঁধাবাঁধি, কষাকষি চলেছে, এর সিকির সিকি আয়োজনও যদি স্বামীকে দেবতা করে তুলবার জন্যে নিয়োজিত হতো তা হলে বরং আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক হতো। আর, আমরাও হয়ত এমন ধারা অমানুষ হতাম না। কিন্তু তা হয়নি, একচোখো সামাজিক অনুশাসনে আমাদের স্বামীসম্প্রদায় ক্রমেই দুঃশাসন হয়ে উঠেছে, আর স্ত্রীসমাজ জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা হয়েছেন 'নরমের যম' আর এঁরা হয়েছেন 'শক্তের ভক্ত'। এমনই করে নরমকে নুইয়ে আমরা সমাজকে শৃঙ্খলিত করেছি।

স্মৃতি-সংহিতা সঙ্কলনের ঢের আগে, মানব সমাজের অতি প্রারম্ভে, যখন মানুষে ও বাঘ-ভালুকে প্রকারগত বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না, সামাজিক শৃঙ্খলার এই সহজ সিদ্ধান্তটি তখন মানুষ আবিষ্কার করেছিল। তার পরে সভ্যতার বিস্তৃতির

এবং উন্নতির সাথে সাথে স্বামীসম্প্রদায়ের এই স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ক্রমশঃ সংস্কৃত হয়ে আসছে। বর্তমান সময়ে কোন সমাজ কত উন্নত, সে সমাজের স্ত্রীজাতির অবস্থাই তার অন্যতম মাপকাঠি। পুঁথি পুরাণ থেকে অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক উদ্ধার করে এ মাপকাঠির ব্যবহার আমরাও দরকার হলে করে থাকি। কিন্তু করলে হয় কি? পাঁজিতে অগাধ জলের কথা লেখা থাকলেও তা নিংড়ালে এক বিন্দুও পাওয়া যায় না। অনুষ্টুপ ছন্দে হাজার বছর আগে যা লেখা হয়েছিল, এতদিন ধরে আমাদের সনাতন জড়তার এবং জাতীয় দুর্দশার কয়লা-বালির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে তা এখন সোজা বাংলায় যে আকারে বেরিয়ে এসেছে, তা নিয়ে আর গর্ব করবার কিছুই নেই।

৩

অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথের মুখে বঙ্কিমবাবু এই স্বগত উক্তিটি দিয়েছেন—'সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী। আমার সূর্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিপদে শান্তি,

চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।'

রোহিণীকে হত্যা করবার আগে গোবিন্দলালও ভ্রমর সম্বন্ধে অনেকটা এই ধরণের মতই ব্যক্ত করেছিলেন। তবে, তখন সময়টা খুব ভালো না থাকাতে, আর উক্তিটিও একেবারে স্বগত ছিল না বলে, ব্যাপারটা স্বভাবতই এর চেয়ে একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

এ দুটি জায়গা পড়লেই আমার মনে হয়, 'এত যদি সুখ তোমার কপালে, তবে কেন তোমার কাঁথা বগলে?' বস্তুতঃ আমাদের দেশে কাঁথা বগলে না আসা পর্যন্ত এ সব কথা ভাববার অবসর কোনো স্বামীরই হয় না। কারণ, 'পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই'—এই হচ্ছে আমাদের দেশাচার।

ও সব কথা যাক। এখন আমি একটু গোলে পড়েছি ঐ 'কেবল স্ত্রী' কথাটি নিয়ে। নগেন্দ্রনাথের কথায় সূর্যমুখী কেবল তাঁর স্ত্রী ছিলেন না। তিনি 'সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী'—এ সব ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁরা 'সম্বন্ধে স্ত্রী' এবং 'কেবল স্ত্রী'—সংসারে এসে কি তাঁরা

করেন? আর যা করেন, সেই কি তাঁদের দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পক্ষে চরম এবং পরম কর্তব্য? নগেন্দ্রনাথের কথার ভাবে বোধ হয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীই 'কেবল স্ত্রী'। আমার মনে হয়, সূর্যমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে তাঁর ভিতরেও 'কেবল স্ত্রীরই' প্রাধান্য 'অধিকন্তু স্ত্রী'র উপরে। তাঁর যে পলায়ন, সেটা নির্জিত 'অধিকন্তু স্ত্রী'র পরে বিজয়ী 'কেবল স্ত্রী'র নির্বাসন দণ্ড।

যথার্থই যদি তিনি নগেন্দ্রনাথের পক্ষে স্নেহে মাতা, পরামর্শে শিক্ষক, চিন্তায় বুদ্ধি—এসব হতেন, তা হলে নগেন্দ্রনাথের সংসার প্রাঙ্গণের বিষবীজ অঙ্কুরিত হবার মোটেই অবসর পেত না। বিরহবিধুর নগেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, সংসারী নগেন্দ্রনাথ তেমন করে কখনও ভাবেন নি! সূর্যমুখী যদি সত্যিই তাঁর চিন্তায় বুদ্ধি হবে, তবে কুন্দসম্বন্ধীয় অমন সর্বনেশে বুদ্ধি তিনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি সত্যিই সূর্যমুখীকে স্নেহে মাতা, পরামর্শে শিক্ষক বলে ভাবতে পারতেন তা হলে আর রূপের নেশা দমনের জন্য তাঁকে মদের নেশার আশ্রয় নিতে হবে কেন?

বস্তুতঃ শিক্ষিত এবং সাধারণ রকমের ধর্মভীরু লোকে প্রলোভনের ভিতরে পড়লে গোল্লায় যাবার আগে যতটুকু ইতস্ততঃ করে থাকে, গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ কেউই তার চেয়ে বড় বেশি কিছু করেন নি। এমন যে দেবীপ্রতিমা, প্রণয়শালিনী, পতিব্রতা, সদা হিতাকাঙ্খিনী স্ত্রীরত্ন, তা তাঁদের

এ সঙ্কটসময়ে কোনই কাজে আসে নি। আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস, এঁদের গৃহিণীরা যদি ভ্রমর সূর্যমুখী ছাঁচের না হয়ে উগ্রচণ্ডা-ক্ষেমঙ্করী ধাঁচের হতেন তা হলে এসব গোলমাল কিছুই হতো না। এর কারণ কি? আমাদের সমাজের সুশীলা, সাধ্বী স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীর নৈতিক অধঃপতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না কেন? অনেকেই ত বউএর পরামর্শে ভাই ছাড়েন, মা ছাড়েন,—কিন্তু কই; এমন ত শুনি না, কেউ কখনও স্ত্রীর চোখের জলে মদ ছেড়েছেন! এর কারণ বেশ স্পষ্ট। যে স্ত্রীরা স্বামীকে কুপরামর্শ দেয়, তারা রূঢ় অর্থে যতই সতী হোক না, পতিগতপ্রাণা তারা নয়। তাদের চিন্তাগত একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, আর সেটি মন্দের দিকে। কাজেই, তারা সেই স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে, মন্দের টানে, স্বচ্ছন্দে স্বামীকে নিজের পথে টেনে আনে। কিন্তু আমাদের পতিগতপ্রাণা স্ত্রীদের ত স্বামী থেকে স্বতন্ত্রসত্তা থাকতে নেই। স্বামীকে 'ভালো' করবার স্পর্ধা তাঁরা মনেও আনেন না। নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া পতনোন্মুখ স্বামীর উদ্ধারকল্পে আর কোন উপায়ই ত তাঁরা জানেন না। যে স্বামী লক্ষ্মীরূপা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে রূপের নেশায় পাগল হতে পারে, সতীর চোখের জলের মর্যাদা সে কেমন করে বুঝবে? কাজেই স্ত্রী যখন বলেন মদ ছাড়তে, সে তখন জবাব দেয়—'সূর্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।' কেবল মদ বলে নয়, সব বিষয়েই আমাদের স্বামীদের এই এক

বাঁধা জবাব। এ জবাবের নির্লজ্জতা ও হীনতা তলিয়ে বুঝবার মত সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের স্বামীদের মন নেই! মাছের পক্ষে জল এবং পাখীর পক্ষে বাতাস যেমন সহজপ্রাপ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষেও সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক নির্ভর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তেমনই অনায়াসলভ্য। কাজেই যে নাকি ছাড়ালেও ছাড়বে না, তাকে দিনের মধ্যে দু শ বার দূর করে দিতে আর আপত্তি কি? যার আনুগত্য এত বেশি, তার আধিপত্যে আর আশঙ্কা কি?

সমাজে এমন হয় কিনা জানিনে; কিন্তু গিরিশ বাবুর সামাজিক নাটক 'গৃহলক্ষ্মীতে' এমনও দেখেছি, পতিপ্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবনিতা আনবার অনুরোধ করছেন স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক 'বিল্বমঙ্গলে' অতিথি-পরায়ণ বণিক নিজ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অতিথির তুষ্টি-সাধনে অনুরোধ করছেন। সাধ্বী, স্বামীর কথা ঠেলতে না পেরে তাতেও সম্মত! এমন সকল আতুরে পতি আর আষাঢ়ে সতীর সৃষ্টি আমাদের দেশের মাটিতে আর আমাদের দেশের সমাজের নাটকেই সম্ভব।

৪

'বালিকা বধূ' 'আর কিশোরী প্রিয়া' পরম রমণীয় পদার্থ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সংসারচক্রে lubricating oil-এর বদলে লক্ষ্মীবিলাস খুব বেশি দিন কার্যকরী হয় না।

কাঁচা-মিঠে আম পাকলে পানসে হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের সমাজে প্রথম মিলন সময়ে বয়সের তারতম্য প্রায়ই বেশি থাকাতে স্বামী-স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থেকে যায়। এ ব্যবধান সব দিক থেকে মিটিয়ে নেবার জন্য কোনো তরফ থেকেই বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর আর আর সব সভ্য সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তা না থাকলে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর কাজকর্ম চেষ্টাচরিত্র, এমন করে কেটে ছেঁটে ভাগযোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, যার যার মতন নিজ নিজ কক্ষায় থেকেও তারা বছরের পর বছর সংসার-মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে পারিবারিক এবং সামাজিক কর্তব্য শেষ করতে পারে—তাদের পরস্পরের বৈষয়িক মতামতের সংঘাত বা অপঘাতের কোনই সম্ভাবনা ঘটে না। 'বুড়ি পরম বৈষ্ণব আর বুড়ো বেজায় শাক্ত' হওয়া সত্ত্বেও তারা 'তুজনাতে মনের মিলে ( ! ) সুখে' থাকতে পারে।

আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তার একান্ত অভাব এমন কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল বলতে চাই, আমাদের পারিবারিক শৃঙ্খলার পক্ষে সেটা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য নয় বলে অনেক স্থলেই সজ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত না হলেও অজ্ঞানে তা কতকটা অবজ্ঞাত হয়। তারই ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। আমাদের চোখে যে মিলন

খুব প্রগাঢ় বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানেও বুদ্ধিবৈষম্যের একটা চোরা-ফাঁক লুকানো থাকে। শত সহস্র কাল্পনিক মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদটা চাপা পড়ে মারা যায় না। তবে সংস্কার এবং অভ্যাসের বশে, সর্বোপরি আমাদের সাংসারিক জীবনের এক-ঘেয়েমির দরুণ, আমাদের অনেকের কাছেই তা ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই—একথা আমি স্বীকার করি।

এই বৈষম্যের ফলেই আমাদের মধ্যে যেখানে যত মিল সেখানে তত গোঁজামিলন। আঘাত পেলেই তা চটে বেরিয়ে পড়ে। বঙ্কিমবাবু, 'বিষবৃক্ষ' আর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজাগুঁজি, জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সামনে ধরেছেন। রবিবাবুও 'ঘরে বাইরে'তে ঠিক তাই করেছেন, বিমলা সম্বন্ধে। সমাজ হয়ত তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। মানুষের মন ছিল তাঁদের লক্ষ্য, সমাজ উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু তাতে কি? মানুষের মন ত সমাজের আওতাতেই বেড়ে ওঠে। কাজেই কবির সৃষ্টিকে সার্থক আর স্বাভাবিক করতে তাঁকে বাধ্য হয়েই মানুষের মনের সাথে সাথে সমাজের পরিণতির রহস্য উদ্ঘাটিত করতে হয়েছে। কবির কথাকে কাজের সাথে খতিয়ে দেখাই জীবিত সমাজের কর্তব্য। আমাদেরও তাই করতে হবে।

সামাজিক বিধিব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি সব সমাজেই আছে। কোনো সমাজেই তা দূর করবার জন্যে কথা ও

কেতাবের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের মত আলোচনা-বিমুখ এবং সমালোচনা-অসহিষ্ণু সমাজ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ে ভ্রমরের চেলীর বহর দেখে ভালো বলব কি মন্দ বলব বুঝে উঠতে পারিনে; আর বিষবৃক্ষ পড়ে সূর্যমুখীর বারাণসীর বাহার দেখে অবাক হই! ফলে, আজ পর্যন্ত আমরা ঠিক করে উঠতে পারিনি আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীদের অঙ্গে কি মানায়। পাঠক রেলে স্টীমারে, সভা-সমিতিতে, ক্রিয়া কর্মে, সর্বত্র এবং সর্বদা আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে থাকেন।

---

# সমাজ ও সাহিত্য

কোনো এক সময়ে হবুচন্দ্র রাজার রাজধানীতে অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থায় দুটি লোক গ্রেপতার হয়েছিল। তারা নাকি দিনে দুপুরে রাজা এবং মন্ত্রী দুজনার চোখের সামনেই রাজবাড়ীর পুরাতন পুকুরটি চুরি করবার মৎলবে সিঁদ কাটছিল! যাহোক, শেষ পর্যন্ত হবু-গবুর সতর্কতায় সে সব ফেঁসে গিয়েছিল, এবং যা ঘটেছিল তা অভিজ্ঞ পাঠকের অগোচর নেই।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের আসরেও নাকি ঠিক এমনি-ধারা সব সিঁদেলের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের লক্ষ্য নাকি আমাদের সনাতন সমাজ। কথাটা আশঙ্কাজনক সন্দেহ নেই; তবে ভরসা এই যে, এ ক্ষেত্রেও হবু-গবু যথেষ্ট বিনিদ্র এবং আশানুরূপ সতর্ক। হবু-গবুর এই বনিয়াদি সতর্কতা আর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ফলে কিছুদিন থেকে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ আমাদের সমাজের স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। এখন সাহিত্য-সেবকগণের লক্ষ্য হয়েছে সমাজসংস্কার আর সমাজপতি মহাশয়দের কাজ হয়েছে সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য এবং সমাজের একটা সহজ সমাহার খুব স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে যখন উক্ত সম্বন্ধ অত্যন্ত

ঘনীভূত, এবং ব্যতিহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন আবার নতুন করে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয় আর সমাজের চৌহদ্দি নির্দেশ নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে উভয়েরই শ্রীহীন হয়ে পড়বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সাহিত্য সমালোচনার সময় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে ও বস্তু সমাজকোষে উপ্ত এবং অঙ্কুরিত হলেও ওর ফুল এবং ফল আকাশেই ফুটে থাকে। তথাকথিত সমাজের মাটি আঁকড়ে যার মন পড়ে আছে, সাহিত্যের সুতার এবং সুগন্ধ থেকে সে যে চিরদিনই বঞ্চিত থাকবে! বেল পাকলে কাকের কি? তবুও যে সমাজের তরফ থেকে সাহিত্যের 'উদ্দেশ্যে লোষ্ট্রবর্ষণ হয়ে থাকে তাতে ত আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অমনি করেই ত ইতর প্রাণী থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অহরহ প্রতিপন্ন হচ্ছে। না মরে ভূত হবার শক্তি ত ঈশ্বর আর কোনো জানোয়ারকেই দেন নি। ও যে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষেরই সামাজিক উত্তরাধিকার। আশার চাইতে মানুষের আশঙ্কা বেশি। এই আশঙ্কার বশে অভিভূত হয়েই ত সাহিত্যের ফুলের ঘায়ে আমাদের মূর্ছার উপক্রম হয়; আর এই আশঙ্কার উদ্বেগে উত্তেজিত হয়েই ত প্রতি মুহূর্তে কাঁচা সাহিত্যের ডাঁশা ফলের আকস্মিক পতনে সমাজের অপঘাত সম্ভাবনায় আমরা অধীর হয়ে উঠি।

আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে আমরা ভুলে যাই যে জনগণের ঐকান্তিক মানস ছাড়া সাহিত্যের ফলে পাক ধরে না। আর,

সমাজের আন্তরিক আহ্বান ছাড়া সাহিত্যের ফল ভূমি স্পর্শ করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালীর অন্তর স্পর্শ করেছে, তাঁর পরলোক গমনেরও বহু বর্ষ পরে। আর বলাই বাহুল্য যে, বসুমতীর সুলভ সংস্করণের বহুল প্রচার তার কারণ নয়। কালের আবর্তনে বাঙ্গালী যখন বহুবর্ষ-সঞ্চিত জড়তা দূরে ফেলে দিয়ে নূতন আশার আলোকে স্নাত পুলকিত হয়ে, নূতন ব্রতে দীক্ষিত হবার আশায় উৎসুক, উন্মুখ, উদগ্র হয়ে উঠেছিল, তখনই ত তারা নূতন করে ঋষিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। তখনই দেশব্রতের বীজমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

একথা যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই খাটে তা নয়। রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সবাইকেই আমরা নবতররূপে পেয়েছি। আমাদের মনের সনাতন জড়তার ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে যে অনাদৃতা সপ্তস্বরা পড়ে ছিল, কালের টানে তার তারে তারে যে আজ সুর যোজনা হয়ে গেছে, তাই না তাঁদের মনের অনুরণন, তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনি আজ আমাদের কাছে এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এমনই করে সমাজ চিরদিনই সাহিত্য থেকে প্রয়োজন এবং প্রয়াস অনুযায়ী ভাব আহরণ করে আপনাকে সুস্থ, পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ করেছে। কিন্তু তাই বলে কি সমাজের প্রয়োজন খুঁটিয়ে, সমাজের বায়নায়, সমাজের তাগিদে কখনও সাহিত্য গড়ে উঠেছে? আমার বিশ্বাস, এমন ধারা 'সামাজিক

সাহিত্য' গড়বার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। পাখার বাতাসে নৌকার পালে হাওয়া লাগে না। তার জন্য চাই স্বভাব-দত্ত মুক্ত পবন। প্রতিভার দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে আত্মসমাহিত সাহিত্যিক যে কল্পলোকের সৃষ্টি করেন বর্তমানের বস্তুতন্ত্রতার মাপকাঠিতে তা যতই কেন নিরর্থক প্রমাণিত হোক না, ভবিষ্য সমাজের সেই হবে পাথেয়।

২

সমসাময়িক সমাজের পথ্য হিসাবে বর্তমান সাহিত্যকে বিচার এবং প্রচার করবার মত ভুল আর কিছুই হতে পারে না। সাহিত্য-আলোচনায় সেই ভুল আমরা নিয়ত করছি। রুগ্ন সমাজের দুর্বল পাকস্থলীর দিকে দৃষ্টি রেখে কখনও আমরা তার জন্য রুটির ব্যবস্থা করছি, কখনও আবার আশু বলাধানের জন্য, অথবা তার রুচি পরিবর্তনের জন্য লুচি সাধছি। সমাজ-শরীরের পরে আমাদের এমন সব সাহিত্যিক পরীক্ষা যে খুব কার্যকরী হয়েছে, এমনটি সন্দেহ করবার কোনো হেতু ত আমার চোখে পড়ে না। আমার বিশ্বাস, সমাজ-সম্বন্ধে অতটা সচেতন হয়ে যা রচনা করা যায় তা সাময়িক সামাজিক সন্দর্ভ হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের পদগৌরব তার ভাগ্যে জোটে না।

এ কথার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলা ইংরাজী নানা দেশীয় নানা সাহিত্য মন্থন করে অনেক নজিরই অনেকে হয়ত এনে হাজির করতে পারেন। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে আমার তথাকথিত

'সামাজিক সাহিত্যের' বিস্তর প্রভেদ। চাঁদের আলোর সাথে চাঁদির ঔজ্জ্বল্যের কি কোনো সাদৃশ্য সম্ভব? প্রতিভাশালী সাহিত্যরসিক চরিত্রসৃষ্টির পারিপার্শ্বিক হিসেবে যখন সমাজচিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর বিশ্লেষণের পরদায়, তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতে, একটা অনায়ত্তের আভাস, একটা অনাগতের আহ্বান, একটা নবতর বিধানের ইঙ্গিত স্বতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে স্বাভাবিক সত্যানুভূতি এবং তাহার অতীব সহজ বিকাশ এই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ, এই হচ্ছে তার চাঁদের আলো।

সমালোচ্য সামাজিক সাহিত্যে এই বস্তুটির একান্তই অভাব। দেশটা অত্যন্ত রকমের সাত্ত্বিকভাবাপন্ন বলেই হয়ত অনেকে এই প্রাণবিহীনতাটাকে গাম্ভীর্য বলে ধরে নিয়ে যথারীতি এবং যথাস্থানে পূজা এবং দক্ষিণাদি দিয়ে থাকেন। এই জন্যেই হয়ত দৈনিকে যার আলোচনা হওয়া উচিত আমরা মাসিকে তার সম্বর্ধনা করি; আর মাসিকে যা ঢুকে গেলেই হতো, আমরা আবার তার আট আনা, এক টাকা, পাঁচ সিকা, সাত সিকা সংস্করণে ঘর আলো করি। এমনই করে আমাদের সাহিত্যে ধারের চেয়ে ভার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওষুধের নামে খোঁজ নেই, অনুপানের হাঙ্গামায় অস্থির।

৩

নৌকায় বসে গুণের দড়াদড়ি ধরে প্রাণপণ টানাটানি করলেও নৌকার গতিশীল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আছে মাস্তুল এবং গুণের গতাসু হবার সমূহ আশঙ্কা। সাহিত্যিক যদি নিজের মনকে সমাজের অতীত, অনধিগত সুরে বেঁধে নিতে না পারেন তবে সাহিত্যের শিব গড়তে না যাওয়াই তাঁর পক্ষে বিধেয়। কারণ তাতে করে খুব সম্ভব সমাজের কল্যাণ হবে না ; কিন্তু সাহিতের অবমাননা হবেই।

মনুষ্য-সভ্যতার পরিণতি, আর তার বিকাশের স্বাভাবিক ধারা সাহিত্যিকের চক্ষে যে আকারে প্রতিভাত হবে, সেই হবে তাঁর সমাজ। তাঁর সমস্ত সামাজিক প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা, গতি এবং রুচির ঝোঁক হবে সেই দিকে। তার চেয়ে ছোটো, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ কোন সমাজের বিধিনিষেধ তাঁর মনেই আসবে না—সাহিত্যসেবায় সমাহিত অবস্থায়। সমাজের দোষগুণ সম্বন্ধে সাহিত্যসেবী অজ্ঞ থাকবেন, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল চাই—ও সবেতে তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ অনাচ্ছন্ন।

সাহিত্যিকের প্রতিভা যদি সুস্থ এবং অবিকৃত থাকে, তবে তাঁর রচনা, তাঁর সৃষ্টি, সামাজিক পাপ এবং মিথ্যাকে স্বভাবতই তিরস্কৃত করবে। সেজন্য তাঁর দিক থেকে অধিকন্তু কোনো চেষ্টার, আর সমাজের তরফ থেকে উদ্দীপনা বা উৎসাহের কোনো প্রয়োজনই হবে না। সৃষ্টির আনন্দ আর প্রকাশের উত্তেজনাই হবে সাহিত্যের চিরন্তন প্রেরণা। তার চেয়ে সঙ্কীর্ণতর কোনো উদ্দেশ্যই লেখকের সাহিত্য-প্রতিভাকে নিঃশেষে উৎসারিত করতে পারবে না।

সাহিত্য থেকে দেশকালোপযোগী ভাব এবং শক্তি সংগ্রহ করা সমাজের পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য ; কিন্তু সমাজের হিতকল্পে দেশকালোপযোগী সাহিত্যের আশা এবং আমদানির চেষ্টা গাভীর বাঁটে দরকারমাফিক, দুধের পরিবর্তে, দই, ক্ষীর, ছানা, মাখনের প্রত্যাশার মতই অসঙ্গত। এবম্বিধ অসঙ্গত আশার বশবর্তী হয়ে সাহিত্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা কখনো হতাশ, কখনো বা উত্তেজিত এবং নিতান্ত কদাচিৎ পরিতুষ্ট হয়ে থাকি।

দরকারের মূর্তি এবং মাত্রা প্রত্যেকেরই আমাদের স্বতন্ত্র ; কাজেই তার মাপকাঠিতে সাহিত্য মেপে সন্তোষজনক কোনো সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। আর, এক্ষেত্রে লেখক আর পাঠকের দরকারের দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকবে। অন্ততঃ তার পরিপূর্ণ মিলন চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের মতই সাম্বৎসরিক এবং স্মরণীয় ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু তা ত নয়! পাঠকের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি পাওয়া না গেলে ত সাহিত্যিকের সাধনাই নিষ্ফল। দরকার অদরকারের খোসাভুষি দূরে ফেলে লেখকের অন্তরতম মানুষটি যখন পাঠকের কাছে এসে সমপ্রাণতার দাবি করে হাত বাড়িয়ে দেয়, কেবল তখনই না সব সংস্কার অভিমান ভুলে গিয়ে, সব সমাজ এবং সম্প্রদায়ের জাল ভেদ করে পাঠক তার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে!

মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত যে মৌলিক মিল, সেইটেই হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ব। সাহিত্যের যত আবেদন এবং আমন্ত্রণ

সবই তার কাছে। সমাজ আর সামাজিক বিধিনিষেধ হয়েছে তার ধরাচূড়া এবং চাপরাশ। দেশ এবং কালভেদে ওদের রং এবং ঢং এর বিস্তর তারতম্য হয়ে থাকে। উক্ত ধরাচূড়ার রিপুকর্ম, অথবা চাপরাশের পিতলের পরিমার্জনা সাহিত্যিকের কাজ নয়। মনুষ্যত্বের রহস্যের 'পরেই হয়েছে সাহিত্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠা। মানুষকে সব দিক দিয়ে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সজাগ এবং সপ্রতিভ করাই সাহিত্যের লক্ষ্য। সাহিত্যকে সমাজের আশ্রিত অথবা সমাজের অভিমুখীন করবার চেষ্টা, অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গকে আবার ডিমের ভিতরে বসাবার আশার মতই বিপজ্জনক। মনুষ্যত্বের মুখ চেয়ে এমনধারা অমানুষিক প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

---

# সাহিত্যে গোঁড়ামি

খুদেদার ভিস্তি নাকি গয়লা সেজে বাংলা সাহিত্যের হাটে খাঁটি দুধ বলে হুবহু ঘোলা জল চালিয়ে দিচ্ছে,—এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর রটেছে! কতিপয় সাধু সাহিত্যিক ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমসাধ্য গবেষণার পর, জল আর দুধের যে তত্ত্বগত তফাৎ, সেটা নিঃশেষে ও নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। আর তাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে কিছুদিন থেকে তাঁরা এমন কথাও বলে আসছেন যে সাহিত্যের পসরায় অজানা অচেনা যা কিছু দেখা যাবে, সবই হবে অখাদ্য; অথবা সাহিত্যের আসরে বাঁধিগৎ ছাড়া যা কিছু বাজবে, সবই হবে বেসুরো।

তাঁদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরাতনের 'পরে নূতন আলোকপাতের চেষ্টা—অনধিকার চর্চা; আর নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়াস—সন্দেহজনক। এই সব সন্দেহ আর অনধিকার চর্চার হাত থেকে আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে গিয়ে সাহিত্যিকদের ভিতরে যে রকম মারামারির সূত্রপাত হয়েছে, তাতে করে সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। আর ইতিমধ্যেই এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ছোটো বড় মাঝারি নানান রকমের চক্রব্যূহের পত্তন

সুরু হয়েছে। দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগ-সন্ধিকাল এসে পড়েছে।

পার্বত্য প্রদেশ ছেড়ে নদী যখন সমতলের বুকে গড়িয়ে পড়ে, তখন তার উচ্ছ্বসিত কলহাসি পরিণত হয় মৃদু গুঞ্জনে; আর উদ্দাম অগ্রগতি পরিবর্তিত হয় বিসর্পিত লাস্যে। বিগত যুগে বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে যে আলোড়ন ও অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল, তা থেকেই বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব। নবীন সাহিত্য তখন নববলে, দৃপ্তবেগে সমাজের বুকে ভেঙ্গে চুরে, গলিয়ে গুলিয়ে, তাণ্ডব তালে নেচে গেয়ে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিয়েছিল। কারও মুখ চায়নি, কোনো রাশ মানেনি!

আর, এখন কালক্রমে সে স্পর্শ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমাদের সামাজিক মনের সে উত্তেজনা ও আবেগ অনেক কমে এসেছে। তারই ফলে সাহিত্যের গতিও মন্দা হয়ে আসছে। সাহিত্য এখন প্রতিপদক্ষেপে সমাজের ঢাল বিচার করছে। এ সব সাহিত্যের জড়তার লক্ষণ। যে অবস্থায় সাহিত্য কেবল সমাজকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, নিজের উদ্ধত অধিকারের প্রেরণায় দেশকালের অতীত হতে পারে না, সে অবস্থায় তার কাছ থেকে বেশি কিছু চাওয়া দুরাশা। আমাদের সাহিত্যের অনেকটা এখন সেই অবস্থা।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি কি না, তা বুঝতে হলে প্রত্নতত্ত্বের দলিল আর পুরাবৃত্তের জবানবন্দির প্রয়োজন।

কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী যে অত্যন্ত ক্ষুধিত সেকথা জানতে সাক্ষী-সাবুদের তলবের কোনোই দরকার করে না। পেটে হাত দিলেই তা মালুম হয়ে যায়। আর সব ক্ষিদের মত আমাদের সাহিত্যের ক্ষিদেও যথেষ্ট প্রবল। আর, এ বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র; তার কারণ, ও রসের স্বাদ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। বর্তমান সাহিত্য আমাদের নতুন করে, বেশি করে, কিছুই দিতে পারছে না; কাজেই তাকে নিয়ে আমাদের এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি লেগে গেছে! ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে ছেলে মায়ের আঁচল ধরে টানবেই। বরং এমন টানাটানির সময়ে, একই দিক ধরে আমরা সবাই একযোগে যে একদিক পানেই টানছি নে, বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য না হলেও এই-ই যথালাভ, অন্তত মন্দের ভালো। আর তা ছাড়া ভালো-মন্দের ডিক্রি-ডিসমিস যত সোজাসুজিই আমরা দিয়ে বসি না, সব সময়ে তা বাহাল থাকে না। আজ আমাদের চোখে যা নেহাৎ খারাপ, কালে তা থেকেই প্রচুর ভালোর সূত্রপাত হতে পারে। রাতের শেষে উষার আগে আঁধারের ধোঁয়া বেশি করে ঘনিয়ে আসে। কিন্তু সে কতক্ষণ?

অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে আজকে যার উচ্ছেদসাধনে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, হয়ত তার 'পরে ভিত্তি করেই আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হয়ে গেছে।

গ্রীষ্মের বিকালে কালবৈশাখী যখন আমাদের খেলাধূলা সব মাটি করে দিয়ে, ঘরের দাওয়ায় নজরবন্দী করে রেখে, আমাদেরই চোখের সামনে গোয়ালঘরের চালা উড়িয়ে, সুপুরি গাছের মাথা ভেঙ্গে নানান রকম অনর্থপাত করতো তখন মনে হতো, বাঁশঝাড়ের মাঝখানে মাথা উঁচু ঐ যে বড় তেঁতুল গাছটা রয়েছে, ওরই এ সব কারসাজি! রাজ্যের যত ঝড়-দমকা সব ওর কালো কালো ডালগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকে, আর খেয়াল হলেই এই রকম সব হাঙ্গামা বাধায়। এ বিষয়ে সন্দেহ আমাদের মোটেই ছিল না। কারণ, প্রমাণ যা ছিল, তা স্পষ্ট রকমে প্রত্যক্ষ। ঝড়ের যত আস্ফালন, যত দাপট, সব ঐ তেঁতুল গাছের ডালপালার ইসারাতেই হতো, তা আমরা বেশ দেখতে পেতাম। তার যত ডাক-হাঁক সব ঐ বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকেই আসতো তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না। তখন মনে হতো তেঁতুল গাছের গোড়া কেটে, অন্তত মাথা মুড়িয়ে দিলেই অতঃপর আর ঝড়ের আশঙ্কা থাকবে না। এখন দেখে শুনে সে মত বদলাতে হয়েছে! এখন আমরা নিজেরাও বুঝি, ছেলেদেরও বুঝিয়ে থাকি যে আবহাওয়ার যোগ-সাজসেই ঝড়-ঝাপটের উৎপত্তি হয়; তেঁতুল গাছের মাথা মোড়ালে তার নিবৃত্তি বা উপশম কিছুই হয় না।

সব ঝড়-ঝাপট সম্বন্ধেই ঐ এক কথা। সাহিত্যিক ঝড়-ঝাপটার মূলেও রয়েছে দেশের আবহাওয়া। শিক্ষা-দীক্ষার

তারতম্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তারাজ্যে কোথাও বা তাপ বেড়েছে, কোথাও বা চাপের মাত্রাধিক্য হয়েছে। তারই ফলে, আমাদের সাহিত্য-প্রকৃতির বর্তমান অবস্থায় এ ঝড় ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে কারো ঘাড়ে এর দায়িত্ব চাপিয়ে, তার সম্বন্ধে কোনো সরাসরি হুকুম, মাথা ধরলে মাথা কাটবার ব্যবস্থার মতই সমীচীন হবে।

সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষে সাহিত্যসেবীদের সমাহার যতই অপরিহার্য হোক না, সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে দ্বন্দ্ব একরকম অনিবার্য। দেশের সবারই মন যে একই সময়ে একই সুরে বাঁধা থাকবে এমন আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই অভাবের 'পরেই ত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার দৌড় আর বুদ্ধির ঝোঁক যদি সবারই সমান হতো, সবাই যদি সব কথা এক দিক দিয়ে আলোচনা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, কিছুই অজানা বা গোপন থাকবার সম্ভাবনা যদি না থাকতো—তা হলে আর প্রকাশের উত্তেজনা কারো ভিতরে আসতো না। অজ্ঞতার অন্ধকার বা সন্দেহের গোধুলি না থাকলে সাহিত্যের আলোক ফুটতো না।

সাহিত্যিক ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুধু অনিবার্য নয়,—স্বাভাবিক এবং দরকারী। বারুদ যদি খাঁটী হয়, তা হলে আশে পাশের চাপে তার কার্যকারিতা বাড়ে বই কমে না। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদও যতই তীব্র আর একাগ্র হয়, মীমাংসাও ততই ঘনিয়ে আসে। তবে, সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে

অসহিষ্ণু বা অধীর হয়ে পড়লে, অর্থাৎ, এক কথায়, মাথা ঠিক না রাখলে, কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছানো সম্ভবপর হয় না এ কথা সব সময়ে মনে রাখা উচিত।

তর্কের সময়ে মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠলে যা একটু আধটু বস্তু ওখানে আছে তা বেবাক বাষ্পে পরিণত হয় ; আর তার বহির্মুখীন চাপ ঠেলে, কোনো যুক্তিই ভিতরে ঢুকতে পায় না। ব্যাপারটাকে মাঝে মঝে নিষ্ঠা বলে ভুল হলেও, প্রকৃত পক্ষে এ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিষ্ঠার সংযম গোঁড়ামিতে থাকে না, আর গোঁড়ামির জ্বালা নিষ্ঠার রাজ্যে অচল। সাহিত্যের গোঁড়ামি হচ্ছে ভাবরাজ্যের দাসত্ব-প্রথা। সাহিত্যসেবিমাত্রেরই উচিত নিজেকে এবং অপরকে এর বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা। বুদ্ধিকে মতের দুয়ারে আবদ্ধ রাখা, আর যার পক্ষেই শ্রেয় হোক না সাহিত্যিকের পক্ষে তা মরণাধিক। দেশের মনকে সজাগ এবং সচল রাখবার ভার যাঁরা স্বেচ্ছায় নিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই যদি মতের নেশায় দিশেহারা হন তবে আর আমাদের আশা কোথায় ?

আশা করি আমার কথায় এমন কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাহিত্যিকদের জন্যে, মতামতের উপদ্রবের বাইরে, কোনো অনির্দিষ্ট ধূম্রলোকের ব্যবস্থা করছি। আমি কেবল বলতে চাই, তাঁদের বুদ্ধির অঙ্কুরগুলো যেন মত আঁকড়ে ধরেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট না থাকে। এক হাতে ঢাল আরেক হাতে তলোয়ার সত্ত্বেও সেপাইএর পক্ষে যুদ্ধ করা মাঝে মাঝে সম্ভব

হয়; কিন্তু সাহিত্যরথীর সব হাতিয়ারই যদি তাঁর অরক্ষণীয় মতের পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তা হলে প্রস্তাবিত অমতের আলোচনা তাঁর পক্ষে স্বভাবতই অসহনীয় হয়ে পড়ে।

গোঁড়ামির তাড়নায় আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, এই পৃথিবীটা আমাদের গতিশীল। কিছুই এখানে সুস্থির অবস্থায় নেই। কালের আবর্তনে সবই পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই অবিরাম পরিবর্তন পরম্পরা হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানব সভ্যতার অব্যবহিত অতীত স্তরের ভিত্তির 'পরে নবতর এবং উন্নততর সোপানের প্রতিষ্ঠাই বর্তমান মানবের লক্ষ্য। নূতনের সৃষ্টিকে আমরা আমাদের লক্ষ্য করে নিই নি; পুরাতনের মধ্যে বুদ্ধির গোঁজামিলন দিতে আমরা ব্যস্ত।

সামাজিক মনের এ ব্যাধি সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী। সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে অতীত আমাদের সহায় না হয়ে অন্তরায় হয়েছে। যা আমাদের অতীতে নেই, তাকে আমরা করি অগ্রাহ্য। আর যার আলোচনা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে তাতে হাত দেওয়া আমরা মনে করি ধৃষ্টতা। লোকসাহিত্যের কোনো বিভাগেই যেন আমাদের নতুন করে শোনবার বা বলবার কিছুই নেই। আমাদের ভূতপূর্ব শাস্ত্রকার এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায় আমাদের সব বিষয়েরই শেষ কথা, সব অভিযোগেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেছেন। আমাদের কাজ হয়েছে শুধু তার ঝুল ঝেড়ে চুন ফেরানো। তাঁরা আমাদের জন্য যে আদর্শ, যে লক্ষ্য বাতলে দিয়েছেন, তা থেকে

চুলমাত্রও এদিক ওদিক যেতে যদি কেউ ইঙ্গিত করে, তা হলে সাহিত্য-সমাজে তার আর জল চলে না, কলকে পাওয়া ত অনেক দূরের কথা!

এমন বজ্রআঁটুনি মাথা পেতে নেওয়া জীবিত সাহিত্যের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। সাহিত্যস্রোত সচল এবং সতেজ রাখতে হলে জলের অত বাছ-বিচার চলে না। ভাগীরথী যদি কেবল সাম-গান-পূতা সরস্বতী আর শ্যাম-বেণু-অনুকারী যমুনাকে কোল দিয়ে, ঘর্ঘরা গণ্ডকী আদি করে সব অকুলীনদের প্রত্যাখ্যান করতেন তা হলে হয়ত সগরবংশ উদ্ধারের ঢের আগেই বেহারের তাপদগ্ধ, পিপাসার্ত কোনো জহ্নু মুনি-নম্বর-দুইএর জঠরে আবার তাঁকে অন্তর্হিত হতে হতো।

বাংলা সাহিত্যের ভাব আর ভাষার চৌহদ্দি নির্দেশ করতে যাঁরা ব্যস্ত তাঁরা প্রায়ই এর গোড়ার কথাটি ভুলে যান। অতীতে যাঁদের প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্য নব কলেবর ও শক্তি লাভ করেছিল, তাঁরা যথার্থ মুক্তপ্রাণ ছিলেন। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে কোনো পরিখা খনন করেন নি। নিজ নিজ বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে পরখ করে যা কিছু মূল্যবান মনে করেছেন, তাই দিয়েই তাঁরা সমাজ ও সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য, সমাজকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সাহিত্য গড়তে বসেন নি। আর, সংস্কৃতমাত্রকেই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রমাত্রকেই অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা সাহিত্যের

আসরে নামেন নি। এই স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভর তাঁদের ছিল বলেই বঙ্গসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তার আসনের আশা পোষণ করে।

অনেক সময়ে আমাদের তথাকথিত সাহিত্যিক রক্ষণ-শীলতার সাফাই হিসেবে আমরা অতীত সাহিত্যিকগণের কথার অবতারণা করে থাকি। অন্ধের মুখে হাতীর বর্ণনার মতন এই সব প্রতিভার আলোচনা আমাদের হাতে যা-ইচ্ছে-তাই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, গোঁড়ামির মোহে আমরা আচ্ছন্ন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণাগুণ ডাইল্যুশনের মাত্রাভেদে কমবেশি হয়। আমাদের মত হাতুড়ের হাতে পড়ে সাহিত্যিকদের গুণাগুণও স্থলভেদে সুবিধামাফিক কমবেশি হয়েছে। কারণ, দরকারমত আমরা সেগুলোকে আমাদের গোঁড়ামির আরকে ডাইল্যুট করে নিতে ইতস্তত করছিনে। এমনিধারা, গোবধের সময় খুড়ো কর্তা করে আমরা নিজেরই মনের কথা পরের মুখে সাজিয়ে দিচ্ছি।

এতে করে সাহিত্যিক আলোচনা একটুও এগুচ্ছে না। অতীতের সাক্ষী যদি নিতান্তই আমাদের নিতে হয়, তবে তাকে সমগ্রভাবে দেখতে হবে। তার সাথে একপ্রাণ হয়ে তার কথা বুঝতে হবে। আগে ভাগে নিজের রায় ঠিক করে ফেলে, পরিশেষে অতীতের সাক্ষী তলব করে তা থেকে যতটুকু রায়ের অনুকূল ততটুকু ছেঁটেকেটে নিলে কোনই ফল হবে না; আমাদের সত্যনিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হবে।

আর, তা ছাড়া, অতীতের ডিক্রি-ডিসমিসের পরে যে আর আপিল চলবে না—এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। অতীতের তাঁরা ছিলেন হাতী-ঘোড়া, আর বর্তমানের আমরা হচ্ছি তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের জীব—একথা যিনি বলেন, তাঁর সাথে একপর্যায়ভুক্ত হতে, আমার বিশ্বাস, অনেকেরই আপত্তি হবে।

---

# লোকশিক্ষা

Patriotism বলতে এ কালে আমরা যা বুঝি, ইতিপূর্বে তা আমাদের দেশে ছিল কি না, সে বিষয়ে অনেক মত এবং প্রচুর তর্কের অবতারণা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে লোকমত বলতে যা বোঝায়, তার সুস্থ, সবল এবং স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সুযোগ আমাদের দেশে কখনও ঘটে নি। নানা কারণে আমাদের দেশের লোকসমূহ কোনো দিনই মাথা তোলবার সুবিধে পায় নি। কাজেই দেশের সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো রকম মত পোষণের মাথাব্যথা তাদের কাছে ঘেঁসতে পারে নি। পেয়াদার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীর চিন্তা এবং পরিকল্পনা হাস্যকর হতে পারে, তাই বলে মোটেই অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের পক্ষে বিনা শিক্ষায় দেশের পরে মমত্ব আরোপের আশা, তাদের বর্তমান অবস্থায়, কেবল অসম্ভব নয়,—নিতান্তই অস্বাভাবিক।

আজীবন যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাজার রকমে প্রমাণ করছে যে তারা দেশের জন্য; দেশে এমন কোনো শিক্ষা নেই, এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই, এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যাতে বুঝিয়ে দেয়—দেশটাও তাদেরই জন্য। দেখে শুনে মনে হয় জাতীয়-উন্নতি-প্রয়াসী শিক্ষিত সম্প্রদায়

দেশের প্রজাসাধারণের 'পরে একটুও নির্ভর করেন না; তারা যেন জাতীয় জীবনের মোটেই আশাভরসার স্থল নয়।

অনেক সময় আমরা মনে করি, শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশটা যদি রাজনৈতিক হিসেবে উন্নত হয়, তবে সব জিনিসেরই চেহারা আপনা হতেই ফিরে যাবে। এখন ও সব ছোটোখাটো বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে বিশেষ ফল হবে না। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্যে ভাবতে হবে না।

ঠিক কথা, কিন্তু ঘোড়া-বাতিকটাকে প্রশ্রয় দেবার আগে, ঘরে চাবুকের কড়িটিও আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখা উচিত নয় কি? আর তা ছাড়া, পরণে যদি আমাদের কাপড় না থাকে, তবে পিঠে আমাদের শিরোপার শাল মানাবে কেন?

লৌকিক মন উন্নতির জন্যে উন্মুখ না হলে, নিজের দুরবস্থার প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে না উঠলে, যথার্থ জাতীয় উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা। ক্ষিদে না লাগলে খাদ্যের ব্যবস্থা, আর তেষ্টা না পেলে জলের জোগাড় শরীরের পক্ষে কখনো উপকারী হতে পারে না। জাতির শরীরের যদি প্রকৃতই উপকার করতে হয়, তবে তার ক্ষিদে যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই করতে হবে। দু চার জন শিক্ষিত লোক যতই ক্ষুধাতুর আর তৃষ্ণার্ত হন না, তাঁরা যে সমস্ত দেশটার ভোজ্য আর পানীয় উদরস্থ করতে পারবেন—সেটা মনে করা নিতান্তই

কষ্ট-কল্পনা। আর দৈবযোগে যদি বা পারেন তা হলে তাঁদের অজীর্ণ ছাড়া আর কোনো লাভ হবে বলে ত মনে হয় না।

লোকমতের অনুমত না হওয়ায় আমাদের অনেক কথা এবং কাজ ভুয়ো এবং ফাঁকা হয়ে পড়েছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভিতরে দু চার জনের বুদ্ধির যতই ধার থাক না কেন, জনসংঘের সহানুভূতির ভার তার পিছনে না থাকাতে, তাতে মোটেই কিছু কাটছে না। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জাতীয়-উন্নতি-সাধনের প্রয়াস আকাশে রাজপুরী নির্মাণের চেষ্টার সামিল। এ রকম ব্যাপার একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই সম্ভব। সুতরাং জাতিগঠনের সুব্যবস্থা করবার জন্য জনগণের চিরাগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। প্রজা চিরদিনই আমাদের দেশে রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হয়ে এসেছে। আর তাতে করেই, পাশার দানের সাথে তাদের রাজার বদল হয়েছে; রাজকন্যার বিবাহে তারা যৌতুক গিয়েছে; ব্রাহ্মণের দানে তারা দক্ষিণা হয়েছে। তাদের যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি, সমবেত সত্তা এবং মহত্তর সার্থকতা আছে, সে কথা তাদের কেউ বলে নি। জাতীয় শক্তির সাধন, জাতীয় আত্মার উদ্বোধন, জাতীয় স্বার্থের সমীকরণ, আমাদের দেশে কখনও হয় নি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের ঐহিক আর পারলৌকিক স্বার্থ এবং পরমার্থের খিচুড়ি পাকিয়ে, তার পরিবেশনের ভার স্বর্গের তেত্রিশ কোটির হাতে দিয়েই দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ফলে দেশের জাতীয় আত্মশক্তিবোধ জাগ্রত হতে পারে নি। অদৃষ্টের দোষ আর দেবতার দোহাই দিয়েই আমরা বরাবর আসছি। অবস্থার উৎপীড়ন নেহাৎ অসহনীয় হলে, —'ঘোর কলি' বলে বক্ষমন্থন করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছি। বসন্তে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাঁদা করে করছি শীতলাদেবীর পূজা। কলেরায় পল্লী মহাশ্মশানে পরিণত হতে চলেছে, আমরা ঘটা করে করছি শ্মশানকালীর পূজা। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই আমাদের দেশ, এর 'পরে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের আক্রোশ বেড়ে চলেছে; নিতান্ত নিরুপায় পল্লীবৃদ্ধেরা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘরের দাওয়ায় বসে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে আলোচনা করছে তাদের কৈশোর জীবনে ধানচালের দরদস্তুর। কেন যে দুর্ভিক্ষ হয়, কেন যে মহামারী এত ঘন ঘন আসে, সে সব তাদের ভাববার বিষয়ই নয়; অমুক সালের ভূমিকম্প বা গত সনের ঝড়ের মতই এ সবেরও কোন "কেন" নেই; আর কিনারা তো দূরের কথা!

জনসাধারণ আশৈশব নিজ নিজ পরিবারবর্গকে প্রদক্ষিণ করেই তাদের জীবনযাত্রা শেষ করছে। পারিবারিক গণ্ডির বাইরেও যে তাদের আদান-প্রদানের যথেষ্ট অবসর আছে, ধ্যান-ধারণার প্রচুর আয়োজন ও প্রয়োজন রয়েছে—সে কথা কিছুতেই তাদের মাথায় ঢুকছে না। অনেক পরিবর্তনের ঝাপটা তাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে; অনেক উৎপীড়নের

কষাঘাত তারা পিঠের 'পরে সয়েছে; কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাদের ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না!

কুম্ভকর্ণের প্রকৃতিটা যে অমনধারা নিদ্রালু হয়ে পড়েছিল সে অনেকটাই তার গায়ের জোরে; আর বাকিটা তার দাদার জোরে। আর আমাদের দেশের প্রকৃতিপুঞ্জের যে তন্দ্রালু স্বভাব, তার সমস্তটাই দাদার জোরে! সমাজের বড় বড় দায়িত্বগুলো যদি নিঃশেষে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত না থাকত; আর তাঁরা যদি সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁদের এই নেতৃত্বভার বহন করবার সুযোগ না পেতেন, তা হলে আমাদের জনসাধারণের এমনধারা লুপ্তজ্ঞান এবং সুপ্তিমগ্ন হবার অবসর বোধ হয় জুটতো না। এই আদিম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই আমাদের সমাজে আভিজাত্য এবং সাধারণ্য বদ্ধমূল হয়ে গেল।

দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে যাঁরা দায়ী ছিলেন, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে দেশের যাঁরা অভিভাবক ছিলেন, তাঁরা ত কখনও প্রজাসাধারণের সহকারিতা বা সহানুভূতি চান নি। তাঁরা চেয়েছিলেন পরিচর্যা, পেয়েছিলেনও শুধু তাই-ই। ফলে, আদিতে যা প্রবর্তিত হয়েছিল সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যে, শেষে তাই পরিবর্তিত হল সামাজিক শৃঙ্খলে।

কাজেই উপর্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণে দেশ যখন বিধ্বস্ত হতে লাগলো, তখন প্রজাসাধারণ তাতে ভ্রূক্ষেপও করে নি। কারণ 'হারলেও রাজার মাটি, জিতলেও রাজার মাটি'—তাদের

কি ? আমাদের মাথাটার সঙ্গে যদি হাত-পা-এর সহানুভূতি না থাকে, তা হলে শরীরের পতন নিতান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে। হয়েছিলও তাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্রীয় অধিকার বিদেশীর দমকা হাওয়ায় অচিরেই অযত্নরক্ষিত কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বিশেষ কোনোই পরিবর্তন হয় নাই। কারণ যুদ্ধটা সেকালে রাজায় রাজায় হতো। আর, তার যতটা আঁচ প্রজার গায়ে এসে লাগতো ; সেটাকে তারা দুঃস্বপ্ন বলেই চিরকাল উড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় প্রাকৃতিক হিসেবে আমাদের দেশটা যত ভালো "অতো ভালোও ভালো নয়"! বরং একটু খারাপ হলেই ভালো হতো। স্নেহমুগ্ধা জননীর মতন অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েই দেশ আমাদের পরকালটি মাটি করে এসেছে। যেখানে বাড়ীর আশে পাশে বিঘে কয়েক জমিতেই সমস্ত পরিবারের খাওয়া-পরা হয়ে, খোল করতাল বাজিয়ে, দিব্যি দিন চলে যেত, সেখানে যে জনসাধারণ ক্রমে 'আদার ব্যাপারী' বনে গিয়ে দেশের কথাকে 'জাহাজের খবর' বলে উড়িয়ে দেবে তাতে ত আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

মানুষের যত কিছু সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা, সবার মূলেই অন্নচিন্তা। এই অন্নের জন্য আমাদের দেশে সেকালে বোধ হয় খুব কষ্ট করতে হয় নি। কাজেই আমাদের সামাজিক শৈশব থেকেই জনসাধারণের কর্মপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও নব নব

উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ স্থগিত হয়ে গেছে। মানুষের মন কিন্তু অবলম্বন-বিহীন হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই আমাদের দেশে কর্মপ্রবৃত্তির হ্রাসের সাথে সাথে ধর্মপ্রবৃত্তির ডাল-পালার বাহার খুলতে সুরু করলে! কর্মের অনুরোধে দেশ সাড়া দেওয়া ত দূরের কথা, কর্ণপাতও করে নি; কিন্তু ধর্মের আহ্বান এখানে কখনও বিফলে যায় নি। শ্রীচৈতন্যের হরিনামের মোহিনীতে দলে দলে মানুষ মন প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে,—বর্গীর হাঙ্গামার রুদ্র তাণ্ডবের প্রতিরোধে কিন্তু একটি প্রাণীও অগ্রসর হয় নি।

এই ত আমাদের দেশ। কর্মের সাধনা, সমবেত সাধনার মহাপ্রাণতা, জাতীয় স্বার্থসাধনের উত্তেজনা কখনো একে স্পর্শ করতে পারে নি। দেশব্যাপী এই বিরাট ঔদাসীন্য আর বিপুল অজ্ঞতা আমাদের যত কিছু জাতীয় দুর্ভোগ এবং দুর্দশার মূল কারণ।

আমাদের অবস্থার যদি পরিবর্তন করতে হয়, তবে যেখানে রোগ ঔষধটাও ঠিক সেইখানেই প্রয়োগ করতে হবে। অনেকে অবিশ্যি বলেন—হাওয়া বদলালেই উপশম হবে। আমার কিন্তু তাতে বড় ভরসা হয় না। হাজার বছর ধরে যা বদ্ধমূল হয়েছে, শুধু হাওয়ার কর্ম নয় তাকে উন্মূলিত করা।

আশা করি, আমার কথায় এমন কেউ মনে করবেন না যে আমি আমাদের জাতীয় ধর্মপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধনের

ষড়যন্ত্রের জোগাড়ে আছি। তার চেয়ে বড় অধর্ম, আর বেশি অসম্ভব কিছুই হতে পারে না। ভাগীরথীকে বরং গোমুখীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আশা করা যেতে পারে, কিন্তু গোটা জাতির মানসিক পরিণতিকে তামাম তামাদি এবং বাতিল সাব্যস্ত করে আবার তাকে কেঁচে গণ্ডুষ করে বসতে বলা ধারণার অতীত।

আমি বলছি, আমাদের সুপ্ত কর্মপ্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং জাগ্রত করতে হবে; আমাদের জাতির অসাড় দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে; আমাদের দেশের অনাদৃত বীণার অনাহত তারে সুর যোজনা করতে হবে। আমাদের জনসাধারণকে উন্নতিপ্রয়াসী করে তুলতে হবে। শিক্ষা দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের মন ফোটাতে হবে, তাদের জাতীয় বিবেক জাগাতে হবে। এ কাজ, যতই শক্ত হোক, আমাদের করতেই হবে। এ ছাড়া আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্য কোনও পন্থা নেই। আমাদের ধর্মপ্রবণতার সাথে কর্মপ্রবৃত্তির যোগ দিতে হবে। তা হলেই, দেশমাতার সোনার মুকুটে মাণিকের ঝালর মানাবে ভালো।

---

# বুদ্ধিমানের কর্ম নয়

তীরে তীরে নৌকা রেখে ভরা নদী পাড়ি দেবার আশা পোষণ করা ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম নয়, আমাদের দেশে এই সোজা কথাটা বোঝা কারও কারও পক্ষে ভারি শক্ত। আলোচ্য বিষয় যখন তাঁদের অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে, তখনই তাঁরা সমাজকে সামনে রেখে স্বচ্ছন্দে শস্ত্র চালনা সুরু করেন। এতে তাঁদের রণকৌশল যথেষ্ট প্রকাশ পায়, কিন্তু পৌরুষ একটুও না। মতামতের আসরে সমাজকে শিখণ্ডীর আসনে নামিয়ে নিয়ে এলে তারও গৌরব বিশেষ বর্ধিত হয় বলে ত মনে হয় না। কথায় কথায় 'মাথার দিব্যি' দিলে সেটা যেমন অবিলম্বে কথার কথায় পরিণত হয়, আমাদের দেশে সাহিত্যের আসরে সমাজের দোহাই জিনিসটাও তেমনই নিরর্থক হয়ে পড়েছে।

সমাজের দোহাইএর আরও একটা দিক আছে। দেশী বাজিকরেরা ভানুমতীর খেলা দেখাতে গিয়ে, প্রথমেই ঝুলি খুলে বের করে বসে—'আত্মারাম সরকারের হাড়'। সমবেত দর্শকমণ্ডলকে নজরবন্দী করবার পক্ষে সেইটেই না কি তাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমাদের সাহিত্যের আসরেও এমনিধারা ভানুমতীর খেলা প্রায়ই দেখা যায়। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাত-সারেই হোক সমাজের মুখবন্ধ দিয়ে আমরা পাঠকসমাজের

'নজরবন্দী' করি। এর ফলে পাঠকের নিরপেক্ষ আলোচনার স্পৃহা এবং অভিনিবেশের শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সমালোচনার ক্ষেত্রে এমনধারা ঐন্দ্রজালিক উপায় কখনও সাধুসাহিত্য-সম্মত হতে পারে না। সবারই মনে রাখা উচিত, সমাজ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজের দেওয়ানি সনন্দ কারও হাতেই ন্যস্ত হয় নি। সমাজ পেটেণ্টও নয়, লিমিটেড কোম্পানিও নয়।

মানুষ অবস্থার উত্তেজনায়, সুবিধার অনুরোধে সমাজ গড়ে। পারিপার্শ্বিক কারণ-পরম্পরায় ধীরে ধীরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ প্রবর্তিত এবং অনুসৃত হয়। যূথবদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সমাজের পার্থক্যই হয়েছে তার পরিবর্তনশীলতায়। মানুষের মন ত ইতর প্রাণীর মনের মত কয়েকটা দানাবাঁধা সহজ বুদ্ধির সমাবেশমাত্র নয়। তার যে সম্ভাবনা অশেষ, পরিণতি অনন্তে। সেই জন্যেই ত মানুষের সমাজের অভিব্যক্তির কখনও শেষ হয় না।

কোনো সমাজের কোনো অনুশাসনই অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। যাঁরা সমাজকে মানুষের উপরে বসাবেন, তাঁরা চুলোর আগুনকে প্রশ্রয় দিয়ে চালে ওঠাবেন। তাঁদের গৃহদাহ অনিবার্য। আমাদের কারও কারও ভাবের ঘরে এমনই করেই আগুন লেগেছে।

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারার উজান বেয়ে গেলে, নিশ্চয়ই এমন সব ঘাটের সন্ধান পাওয়া যাবে যা এখন নিতান্তই

আঘাটা। ঘাটকে আঘাটা, আঘাটাকে ঘাট কে করেছে ? যুগে যুগে সমাজশরীরে যে সব পরিবর্তনপরম্পরা সংঘটিত হয়েছে, সে কার ইঙ্গিতে, কার অনুরোধে ? সমাজ কিছু আর সৌর-জগতের অংশবিশেষ নয় যে, সামাজিক জীবের সনাতন জড়তা সত্ত্বেও, তার ঋতু-পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন হবে। মানুষের মনই ত সমাজের পক্ষে সোনার কাঠি, রূপার কাঠি। তার ঘাত-প্রতিঘাতেই ত সমাজ-প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের জ্বালা আর বর্ষার বিরহ, শীতের সন্ন্যাস আর বসন্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। যখনই যে কোনো কারণেই হোক না, কোনো সমাজের মানুষের মানসিক গতি স্থগিত হয়েছে, তখনই শুধু সে সমাজ স্থাবর হয়ে সহসা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মনের ফোয়ারা জমাট বেঁধে গেলে সমাজের স্রোত স্বভাবতই মরে আসে। সে অবস্থা উন্নতির পরিপন্থী।

সমাজকে উন্নতির অনুকূল রাখতে হলে, সামাজিক মনের গতি সব দিকে অব্যাহত রাখতে হবে। মনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও প্রসারিত করতে হবে। এতে সমাজের প্রতিপত্তি কমে যাবে, এমন ভয় করলে চলবে না। বাছুর দুধ খেতে খেতে গাভীর পদ-আস্ফালন আর শৃঙ্গ-তাড়না উপেক্ষা করেও পরম আগ্রহভরে মাতৃস্তনে আঘাত দিয়ে নবাগত স্তন্য-স্রোতের সদ্ব্যবহার করে থাকে, তাতে তার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় কি না বলা যায় না, তবে মায়ের অপত্যস্নেহ যে কমে না সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। আমার বিশ্বাস, সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা

খাটবে। সমাজের পরিণতির সম্ভাবনা বহুবিধ এবং বহু-বিস্তৃত। কিন্তু সে সবই যে আঘাতের অপেক্ষা রাখে। সময়োচিত আঘাতই ত সমাজের প্রকৃত উদ্বোধন; এ কাজে যাঁরা বাধা দেবেন সমাজদ্রোহী তাঁরা।

২

ভক্তির আতিশয্যে আমরা সমাজকে যে ক্ষীণ আর ক্ষণ-ভঙ্গুর মনে করি, সেটা আমাদের কল্পনার দৈন্য অথবা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনের সামাজিকতা যতদিন থাকবে সমাজও ততদিন কোনো না কোনো আকারে থাকবেই। এ জিনিস ভাঙ্গে না, কেবলই গড়ে, কেবলই বাড়ে। সমাজের কোনো একটা বিশেষ মূর্তির 'পরে অহৈতুকী ভক্তি, কোনো এক বিশিষ্ট ধরণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের 'পরে অন্ধ পক্ষপাত কখনো মনের স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয়। বর্তমানের 'পরে অসন্তোষ-অতৃপ্তির ভিতরেই ত ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির বীজ নিহিত রয়েছে।

জগতের সমস্ত উন্নত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে যে 'হারামণি'র অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তা থেকে কেন আমরা সমাজকে একঘরে করে রাখতে চাইব? আর চাইলেই সে চেষ্টা কি সফল হবে? চোখ মেলে সমাজের পানে চাইলেই ত সে ব্যর্থ চেষ্টার শত সহস্র নিদর্শন সর্বত্র দেখতে পাবো। এ ব্যাপার এত স্পষ্ট, আর এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়ে সে সব দেখাতে

যাওয়ার মানে—পাঠকের দৃষ্টিশক্তির প্রতি অবিচার করা। হাতের কঙ্কণ আরশিতে দেখে আর লাভ কি! শিক্ষিত পাঠক সরলভাবে নিজের নিজের মন অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন তার ঘাটে ঘাটে 'পুরাতন' সমাজের কত 'সনাতন' বিধি-নিষেধের শব অন্ত্যেষ্টির অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। তথাকথিত সমাজের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁদের প্রতি যে আমাদের সামাজিক কর্তব্য তা আমরা বরাবর উপেক্ষা করেই আসছি। ফলে, আমাদের মনে যা মরে রয়েছে, কাজে তাই ভূত হয়ে নেমে আসে। বর্তমান কালে শিক্ষিত লোকের 'সামাজিক নিষ্ঠা' মানে সুনিপুণ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে সব সময়ে এটা ধরা পড়ে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। আমরা প্রত্যেকেই বানান করছি 'বি-ড়া-ল,' আর সকলে মিলে উচ্চারণ করে আসছি 'মেকুর'। সমাজের এ সদর-মফস্বল রহস্য আর-কতদিন চলবে?

বিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৈষম্য নাকি অতীত যুগের নানা বিজাতীয় সংঘাত আর অপঘাতের মাঝে আমাদের সমাজ আর সভ্যতার পক্ষে রক্ষা-কবচের কাজ করেছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁরা পাশ্চাত্য সংঘর্ষে নিগ্রো আর রেড ইণ্ডিয়ানদের শোচনীয় পরিণামের উল্লেখ করতেও ছাড়েন না। যেন তারা আমাদের, আর আমরা তাদের মাসতুতো ভাই! আমি সে কথা

মানি না। আমার মনে হয়, তাঁরা কার্যটাকে কারণ বলে ভুল করেছেন। আমাদের সমাজে সদর-মফস্বলের বৈষম্য ছিল বলে হিন্দু-সভ্যতা যে আজ জানে-প্রাণে বেঁচে আছে, সে কথা ঠিক নয়। হিন্দু-সভ্যতা বিজাতীয় সভ্যতার সংঘর্ষে একেবারে অভিভূত হয় নি বলেই, প্রাণে মরে নি বলেই, আমাদের সমাজে সদর-মফস্বলের সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা দুর্ঘটনা; হিন্দু-সভ্যতা চালাকি করে বাঁচে নি,—বেঁচেছে গায়ের জোরে। তার মূলে যে অমৃত সিঞ্চিত রয়েছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্য-সভ্যতার যে মহীয়সী বাণীর অনুরণন রয়েছে, তারই সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে সে জর্জরিত হয়েও জীবন হারায় নি।

একটা উপমা দিলেই বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। আমি যদি হঠাৎ দোতালার ছাদ থেকে একেবারে মাটিতে পড়ে যাই,—তাতে যদি আমার পুঁটি মাছের প্রাণ বেরিয়েই যায়,—তাহলে ত সব দেনা-পাওনাই চুকে গেল। কিন্তু যদি আমার জীবনীশক্তি যথেষ্ট প্রাণবন্ত থাকে, সোজা কথায়, যদি আমার আরো কিছুদিন পরমায়ু লেখা থাকে, এবং পড়ে গিয়ে না মরে আমি যদি হাত-পা ভেঙ্গে নিতান্তই অকর্মণ্য হয়ে যাই, তা হলে বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন না। আর এমন কথা মনে করাও সঙ্গত হবে না যে, হাত-পা ভেঙ্গে গেছে বলেই প্রাণটা বেঁচেছে। দুর্ঘটনার লক্ষ্য ছিল প্রাণ, কিন্তু ও বস্তু আমাতে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ছিল বলে দুর্ঘটনার

ফল সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি, হাত-পায়ের 'পরে ঝাল মিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। হাত-পা যে ভেঙ্গেছে তাতেও আমার বিশেষ হাত নেই; আর প্রাণটা যদি যেত তাতেও আমার কিছুই বলবার ছিল না। তবে ও বস্তু যে যায় নি সেটা হচ্ছে— আমার পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যের জোর। প্রাণটাই যদি যেত, তা হলে হাত-পা ভাঙ্গত কার। প্রাণটা যায় নি বলেই ত হাত-পা-ভাঙ্গা অবস্থার দুর্গতি ভোগ করবার জন্যে রয়েছি আমি।

সামাজিক কপটতা হচ্ছে আমাদের সামাজিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-শক্তির ঐকান্তিক অভাবের ফল,—আমাদের সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতার দণ্ড। প্রায়শ্চিত্তকে পৌরুষ বলে গরব করার চেয়ে হীনতা আর কি হতে পারে? এতে শুধু প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা, তার উদ্‌যাপন, অযথা বিলম্বিতই হচ্ছে।

৩

মতামতের ঘনঘটার ভিতরে আর একটা জিনিসের বেশ প্রচুর এবং পর্যাপ্ত বর্ষণ দেখা যায়। 'শান্তির বারি' নয়, সেটা সংযমের বক্তৃতা। সবুজ-দমনে সঙ্গিন-হস্ত সম্প্রদায়ের মুখে সংযমের বক্তৃতা সাজে ভালো, ছোটে খুব।

হতে পারে, সবুজের বিরুদ্ধে অসংযমের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রবীণের পক্ষে জলে না নেমে সাঁতার কাটবার কল্পনা মনে স্থান দেওয়া যে নিতান্তই 'মিথ্যাচার' সে সম্বন্ধে আর দুই মত হতে পারে না।

যে কাজ করে, ভুল করবার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে। তাই বলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ম? জাতীয় জীবনে কর্মের উদ্দীপনা এলে অধিকারের সীমা মাঝে মাঝে অনধিকারের রাজ্যে গিয়ে পড়বেই। তাই বলে বর্গীর ভয় দেখিয়ে দেশের সব নবীন প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই কি বুদ্ধিমানের উপদেশ? পাটোয়ারী হিসেবে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে, সংযম আর সঙ্কল্পের পাইকারী দর যাচাই করে, উদ্দীপনার আমদানি-রপ্তানি, ভাবের হাটে কোনো দিনই সম্ভবপর হয় না। এ কাজ করতে যাঁরা বিশেষ ভাবেই ব্যগ্র, কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ আসে—তাঁরা বুঝি কাজ না করবার ছুতো খুঁজতেই ব্যস্ত। উচ্ছ্বাস যেখানে নেই, সংযম সেখানে নিরর্থক। উপার্জনের উন্মাদনা যেখানে কোনো কালেই ছিল না, সঞ্চয়ের সংযম সেখানে কোন কাজে লাগবে? গ্রীষ্মের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রলীলাই ত পরবর্তী বর্ষার মেঘমেদুর স্তব্ধতাকে সার্থক করে দেয়। আমাদের সামাজিক প্রকৃতিতে শীতের শিশির শুকাতে না শুকাতেই যাঁরা বর্ষার জলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সামাজিক প্রকৃতি থেকে যাঁরা বসন্তের উচ্ছ্বাস আর গ্রীষ্মের উদ্দীপনাকে নির্বাসিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর, আমার বিশ্বাস তাঁদের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা আর অসঙ্গত আশা কখনো সফল হবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে—কর্ম থেকে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ থেকেই পর্জন্যের উৎপত্তি।

সামাজিক অসংযমের সমালোচনা-ব্যপদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি—ব্যক্তিগত চিন্তাস্রোতের স্বাধীন প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলে, সামাজিক ঐক্য ও পারিবারিক বন্ধন শ্লথ এবং শিথিল হয়ে, অচিরেই স্খলিত এবং বিধ্বস্ত হবে। এ সব শোচনীয় পরিণামের মর্মভেদী বর্ণনা আমাদের লেখনীমুখে এমন জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে,—পড়লে মনে হয় যেন এইমাত্রই লেখক তেমন একটা দেশ থেকে ফিরে আসছেন, যেখানে ভাই ভাইকে সম্মান করে না, বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে স্বাধীন চিন্তার উত্তেজনায় অবলীলাক্রমে বাপের গলায় ছুরি বসায়, মা স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নবজাত শিশুকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, হয়ত বা, নবজাত শিশুও উত্তরাধিকার-সূত্রে 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' লাভ করে পূতনা-বধের পুনরভিনয় করে থাকে। ব্যাপার গুরুতর বটে। কিন্তু ততোধিক গুরুতর আমাদের এই সর্বজ্ঞতা। 'সর্বজ্ঞ' উপাধিটি লাভ করতে হলে যে বিশেষ গুণটি আয়ত্ত করা দরকার, গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষ রূপেই তার চর্চা হয়েছে আমাদের দেশে। তারই ফলে, উন্নতিশীল সভ্য সমাজ-সমূহের সুধী সম্প্রদায় আজ যে সব সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন, আমাদের নখদর্পণেই আমরা তার সমাধান দেখতে পাচ্ছি। সেটি হচ্ছে, আমাদের সনাতন শাস্ত্রীয় সালসা, আর তার সাথে দেশাচারের সহস্র অনুপান।

এ যেন শিশুর কান্নাকাটি থামাতে গিয়ে দুধের সাথে

আফিমের প্রয়োগ। আমরা যাকে শান্তি বলি প্রকৃত পক্ষে সেটা হচ্ছে সামাজিক সুষুপ্তি। এই যদি সামাজিক জীবনের চরম লক্ষ্য হতো, তা হলে অবশ্য ও-ব্যবস্থা খুবই সমীচীন এবং বিজ্ঞানসম্মত হতো। কিন্তু তা ত নয়। অন্নচিন্তা যার নেই এমন লোকের পক্ষেও পক্ষাঘাত খুব লোভনীয় হতে পারে না। সমস্যা-পরিশূন্য অবস্থাই ত সামাজিক জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাত। এমন কোনো শাস্ত্রানুশাসন-সূত্রের সমাহার কল্পনাতেও আনা যায় না, যাতে করে মানুষের ক্রমবিকাশশীল মনের সকল রকমের সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর হয়।

এই অসম্পূর্ণতার ফাঁক দিয়েই ত যুগে যুগে মানুষের চিন্তা এবং সাধনা সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করেছে। যে দিন আমরা এ প্রবেশ-পথ বন্ধ করেছি, সেই দিন থেকেই আমাদের সমাজে সামাজিক উচ্চ চিন্তার স্রোতও মরে এসেছে। আজ যে আমাদের সমাজ-জোড়া এত অশান্তি—এই, নমশূদ্র তার জল চালাতে চায়, কৈবর্ত আর ভাড়া খাটতে চায় না, বারুই যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকারের জন্য ব্যগ্র—এ সবই ত সেই বন্ধ দুয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে সবুজ মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, এর ভিতরে সমাজ-বিদ্বেষ নেই, আছে সমাজকে গতিশীল করবার আগ্রহ।

দেশে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রবর্তনের সঙ্কল্প মনে না এনেও, স্বরাজের আশা পোষণ করা যদি সম্ভব হয়, তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার

কুমৎলব না এঁটেও, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা কষ্টকল্পনা বলে গণ্য হবে কেন? দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে অসহিষ্ণু করে তোলবার চেষ্টা যদি দেশ-ভক্তির পরিচয় হয় তবে সমাজের হীনতা, অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করবার চেষ্টা কোন যুক্তিবলে সমাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে? রাজনৈতিক আলোচনায় নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, পরের প্রবলতার তলে নিজের দৌর্বল্য চাপা দিয়ে নানান রকমের মুখরোচক প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়; আর সামাজিক সমালোচনায় সকল দোষ মাথা পেতে মেনে নিয়ে, পরে কর্মক্ষেত্রে নামতে হয়। এই কারণেই কি এ বিষয়ে আমাদের এত বিরাগ? রাজনৈতিক আন্দোলনে পরের রাঁধা ভাতে বেগুন সিদ্ধ দিয়েই, এ পর্যন্ত আমরা দেশের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তা শেষ করে আসছি; কাজেই, এখন সামাজিক ব্যাপারে, নিজের চুলিতে নিজের ফুঁ দেবার কথায় যে আমাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হবে—তাতে বিশেষ আশ্চর্য হবার আর কি আছে!

৪

বহু যুক্তিতর্কের আড়ম্বর দিয়ে অনেক সময়ে আমরা আর একটা কথার অবতারণা করে থাকি। কান্তকবির তরজমায় সেটা হচ্ছে—'যা করবে আস্তে ধীরে, ঘা করো কেন খুঁচিয়ে'। এবংবিধ আপত্তির মূলে রয়েছে আমাদের কর্মবিমুখতা।

সামাজিক গতিশীলতা এতদিন ধরে বন্ধ থেকে, আজ স্বতই যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, এমন আশা করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত এমন অভ্যস্ত প্রক্রিয়া আর মানুষের জীবনে কি আছে! তবু দুচার মিনিটের জলে-ডোবা-মানুষের প্রাণবায়ুর চলাচল আবার নিয়মিত করতে তার হাত-পা ধরে কতই না সাধাসাধি করতে হয়।

জাপানে এবেলা ওবেলা দুবেলাই প্রায় ভূমিকম্প হয়; কাজেই জাপানীরা সেটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ধরে নিয়েই বাড়িঘর তৈরি করে। আর আমাদের এখানে কালেভদ্রে ভূমিকম্প হয়; আমরা ঘরবাড়ি বানানোর সময় তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাই নে। এই জন্যেই আমাদের দেশে ভূমিকম্প যখন হয়, তখন বেশ একহাত দেখিয়েই যায়। মুক্তপ্রাণ, গতিশীল সমাজের পক্ষে সংস্কার-ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক; আর আমাদের সমাজের পক্ষে সংস্কার হচ্ছে ভূমিকম্পের মতই স্মরণীয়! আমাদের সমাজের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল; আর তাতে করে আমাদের মনের অবস্থাটাও—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি, ধরণের হয়ে গিয়েছে। আমাদের সামাজিক মনের নঙ্গর বহুকাল সঞ্চিত পাঁকের নীচে এমনই শক্ত হয়েই এঁটে বসেছে যে যথেষ্ট জোর-জবরদস্তি ছাড়া এ ওঠবার নয়। কিন্তু এতে হাত দিলেই আমাদের বুকে বাজে। অভ্যাসের পাঁকটাকে আমরা সমাজের প্রাণবস্তু বলে ভুল করি; পর-

গাছাকে আমরা গাছের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করি। এই কারণেই সমাজের প্রাণ ক্রমেই কোণ-ঠাসা হয়ে যাচ্ছে ; আর, দেহ ক্রমেই রক্তশূন্য হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থার প্রতিকার-চেষ্টা কি সমাজদ্রোহ? দেশের সামনে সমাজের দূষিত অংশ অনবগুণ্ঠিত করা কি দূষণীয়? দুঃসময়ে গ্রহ-বৈগুণ্যে সমাজে যে সব দোষ ঢুকেছে, সেগুলিকে সমাজের অঙ্গীভূত থাকতে প্রশ্রয় না দিয়ে বিদূরিত করবার চেষ্টা করা কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা? আমার ত মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই এটা কর্তব্য হওয়া উচিত। সমাজের 'আসন্ন বন্ধু'দের মতে এ কাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল বলে বিবেচিত হয়, তা হলে আমাদের মনে এ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়াই বর্তমানে প্রয়োজন হয়েছে। আজ শৃঙ্খলিত অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, হয়ত, আমাদের মনের সদিচ্ছা কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে দাঁড়াবে ; কিন্তু পরিণামে শৃঙ্খল যখন টুটে যাবে, তখন স্বভাবতই সমাজে আবার শান্তির প্রবাহ চলবে।

ত্রেতায় যুগাবতারের কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল পাষাণী-উদ্ধারে। তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা নবজীবন লাভ করেছিল। বর্তমানে আমাদের দেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের অর্দ্ধস্ফুট উষার আকাশে, চক্রবালের কোলে কোলে, মেঘের নীচে যার আলোর রেখা মাঝে মাঝে ফুটে উঠে আমাদের সকলের মনকে নিয়ে এমন করে খেলা করছে, তারও প্রথম কাজ হবে—পাষাণ-উদ্ধার—আমাদের

সামাজিক মনের শাপ-বিমোচন। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আমাদের কর্মজীবনের লক্ষ্য, আমাদের সাহিত্যিক জীবনের সাধনা যে আলোতে মণ্ডিত হয়ে, রঞ্জিত হয়ে, আজ আমাদের আঁখির আগে এসে দাঁড়িয়েছে, তারই সামনে উন্মুক্ত করে দিতে হবে—আমাদের সামাজিক মনের সকল দুয়ার—সদর খিড়কি দুই-ই।

---

# বেহিসাবের নিকাশ

সুখস্পৃহা জীবনের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি মানুষের সহজ কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উক্ত প্রবৃত্তির প্রচারকল্পে পণ্ডিতেরা যখন মধুমক্ষিকা আর পিপীলিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিমুখ বা সন্দিগ্ধ মনকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস পান, তখন সঞ্চয়ী লোকের হুল এবং বিষ সম্বন্ধেও কারও কারও মনে স্বতই একটা অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে।

প্রাণিজগতের ঐ সব স্বভাব-সঞ্চয়ী অধিবাসিবৃন্দের পদ-মর্যাদা মানুষের চেয়ে এত বেশি, আর তাদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত এতই বৈষম্য যে, তাদের সংস্কারগত সঞ্চয়পটুতার অনুকরণ-প্রয়াসে আমাদের পক্ষে সম্যক সফলকাম হবার সম্ভাবনা অতি কম। জন্মান্তরীণ সংস্কারের বশে যদিই বা কেউ এ কার্যে কতকটা সফলতা লাভ করতে সমর্থ হন, তা হলেও সমাজের দিক দিয়ে তার মূল্য যে কেমনতর আর কতটা, তা নিয়ে তর্ক উঠবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে। হুলের ঘা মধুর প্রলেপে সারে কি না, সমাজ-বৈদ্যগণ এখনও তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। সেই জন্যেই হয়ত এ-বেলা ও-বেলা তাঁদের ব্যবস্থা বদলাচ্ছে। কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে শেখাচ্ছেন—সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে; আবার পরক্ষণেই

কানে পাক দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—অর্থই অনর্থের মূল। সভাপর্বের পরে বনপর্বের অবতারণা করছেন; অশ্বমেধের ঘটার পরে স্বর্গারোহণের অন্তর্জলির ব্যবস্থা দিচ্ছেন!

এই সব অব্যবস্থিততা এবং অনবস্থিতি দেখে শুনে পণ্ডিতেরা সুখদুঃখময় সংসারটাকে চাকার সাথে উপমিত করে নানা ভাষায়, নানান ছাঁদে যে সব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বলা বাহুল্য, তাতে মীমাংসা কিছুই এগোয় নি, বরং পিছিয়েছে। অপণ্ডিতেরা তর্ক তুলেছে,—চাকাই বা হতে গেল কেন? নৌকাও ত হতে পারত! তা হলে ত গড়গড়িয়ে না গিয়ে দিব্যি তরতরিয়ে সরসরিয়ে চলত। দুঃখের ধূলাকাদায় অমন নাস্তানাবুদ হয়ত হত না।

মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তিটার আরোপ নিশ্চয়ই আদিযুগের কোনো এক বিশ্বামিত্রের কাজ। এতে যদি ঈশ্বরের হাত থাকত তা হলে কি যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁর যে সব ওয়ারিস বা সরিক অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাঁরা এর 'পরে এত বিরক্তি দেখাতে পারতেন? মহর্ষির অভিপ্রায় সম্ভবত মন্দ ছিল না। কিন্তু যা শাশ্বত নয়, কালের বশে তার প্রয়োজনের পরিবর্তন হবেই হবে। সভ্যতার উন্মেষ-উষায় যখন শীতের কাপড়ের চেয়ে শীতের কাঁপুনি অনেকগুণে বেশি ছিল, তখনকার দিনের রোদে পিঠ দিয়ে বসার সার্থকতা এখনকার সামাজিক মধ্যাহ্নে আর ত নেই। তাতে শুধু এখন স্বাস্থ্যহানি এবং বর্ণকালিই সার হবে।

এখন এই দীপ্ত মধ্যাহ্নে—সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে, এ মন্ত্রের পরিবর্তন করে এমন কোনো মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে এই প্রখর রশ্মিজ্বালা প্রত্যাহত হয়ে মৃদু আলোক-মালায় পরিণত হতে পারে।

২

ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান-প্রয়াসও যে অবশ্য করণীয় সে বিষয়ে ত কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেই যে উক্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন মনে না করবারও যথেষ্ট হেতু রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের কোলে ঝোল টানতে আরম্ভ করি, তা হলে খুব সম্ভব, ঝোলে অচিরেই টান পড়বে। কারণ বর্তমানের ক্ষিদের চেয়ে ভবিষ্যতের লোভ অনেক বেশি। প্রত্যেকেই যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে রূপচাঁদের আভায় ফুটফুটে করতে প্রয়াস পাই, তা হলে অনেকের ভাগ্যেই চিরকাল সরষের ফুল দর্শন অনিবার্য হয়ে উঠবে। কারণ, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এবং সুযোগের সম্মিলন আমাদের ভিতরে যাঁর ভাগ্যে জুটবে, উক্ত লোভনীয় কার্যে 'ইতি' দেবার প্রয়োজনীয়তা কখনও তিনি অনুভব করবেন না।

বর্তমানের সম্ভোগ যতই বেহিসাবী হোক না, তার একটা সীমা থাকবেই। পেটুকের পেট না ভরলেও তার চোয়াল ধরবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হচ্ছে অনেকটা অদৃষ্টকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা ; পুরুষপরম্পরাক্রমে করলেও কোনো দিনও তার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

ব্যক্তি-বিশেষের অপরিমিত অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হতে চুরির প্রয়াস, সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সমাজের ডালপালা ছেঁটে, তার গলা চেঁচে, সঞ্চয়ের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিলে অনতিবিলম্বেই যে তা তাড়ি হয়ে উঠবে—সে ত অতি সুনিশ্চিত। হয়েছেও তাই। এ সামাজিক অকল্যাণ দূর করতে হলে ব্যক্তিগত জীবনকে তথাকথিত সঞ্চয়ের নেশা থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। যতদিন না সঞ্চয়-প্রবৃত্তির একটা নবতর সংস্করণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন 'সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে' আর 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' এ দুটি কথায় সময়ে সময়ে বিশেষ কোনই তফাৎ থাকবে না।

অনেক সময়ে শুনতে পাওয়া যায়, মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির আধিক্যের ফলেই, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র আদি করে সব বিষয়েই মানুষ আজ এত উন্নত ; এ কথা ঠিক নয়। পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠবার একটা সহজ প্রেরণা জীব-মাত্রেরই ভিতরে আছে। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষেতে এর চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তারই উন্মাদনাতেই মানুষ নিজের

মনুষ্যত্ব সব দিক দিয়ে প্রতিপন্ন না করে স্থির থাকতে পারে নি। মানব-সভ্যতার বস্তু আর ছন্দ দুই-ই নিতান্ত বেহিসাবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। হিসাব মাঝে মাঝে তাতে সুর যোজনা করেছে মাত্র। আর তা যে অধিকাংশ স্থলেই বেসুরো বাজছে, সে কথা বুঝতে হলে হিসাবের কানমলা থেকে কান বাঁচিয়ে চলা নিতান্ত দরকার। মানুষের স্বাভাবিক চয়ন-লীলার 'পরে একটা সুদীর্ঘ ষট্‌পদী হিসাবের উপসর্গ চেপেই সঞ্চয়-লোলুপতার সৃষ্টি করেছে। চড়ন-দারকে ঘোড়ার মালিক মনে করলে অনেক সময়েই ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে।

সঞ্চয়ের ধর্মই হচ্ছে, বর্তমানের বিকাশ এবং ব্যাপ্তির যে মূল্য, যে পাথেয়, তাই জমিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে পথ্যের সংস্থান। এ যেন শিশুর 'আট কড়াই' থেকে খই-চিঁড়ে তার ভাবী শ্মশানবন্ধুদের জন্যে তুলে রাখবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এমন হিসাবী অভিভাবকের হাতে পড়লে সমাজ-শিশুর ভবিষ্যৎ একটুও আশাপ্রদ হতো না। কিন্তু, সুখের বিষয়,—তা পড়ে নি। হিসাবী লোক কি কখনও 'ঘরের খেয়ে বনের মহিষ' নিরর্থক তাড়াতে যায়! পুষ্করিণীর মৎস্য তার চেয়ে ঢের বেশি উপাদেয় এবং নিরাপদও বটে। আশু চক্রবৃদ্ধির আশা না থাকলে হিসাবী লোক কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এমন কি, রাঁধা মাছ মারতে পারলে পুকুরের ধারেও যেতে চায় না। কাজেই এহেন হিসাবী

তথা সঞ্চয়ী লোকের কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, এ কথা অনেকটা কাকের ডাকাডাকিতেই ভোর এসেছে বলার মতই সুসঙ্গত।

৩

মানব-সভ্যতাটা অভাবের তাড়নায় গড়ে ওঠে নি। ও বস্তু স্বভাবের প্রেরণাতেই ফুটে উঠেছে। অভাবটা যদি কর্মের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা হতো, তা হলে খুব সম্ভব হাঁসেরা আজ পুকুর কাটতে শিখত; গরুরা কেবলই জাবর না কেটে মাঝে মাঝে আঁটি আঁটি ঘাসও হয়ত কাটত;—আরো কত কি হতো। কিন্তু তা হয় নি। কারণ, ইতর জীবের অভাবের তাড়নার তুলনায় স্বভাবের প্রেরণা নিতান্তই অস্পষ্ট। আর, মানুষের অনেকটা তার বিপরীত। মানুষ শুধু অভাব মেটায় না; নূতন নূতন সৃষ্টিও করে। এমনধারা সৃষ্টি-কার্যে তার যে খরচ তা যে নিতান্তই বেহিসাবের বাজে খরচ—সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

মানবসভ্যতার নব নব বিকাশশীলতা, নিত্য নব উদ্ভাবন-প্রবণতা ত চিরদিনই এমনিধারা বেহিসাবের অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে আসছে। হিসাবের উচ্ছিষ্টে নিশ্চয়ই তার পুষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাব-প্রবৃত্তি আর সহজ সামাজিক বেহিসাবের দ্বন্দ্বে যখন হিসাব জয়ী হয়—মানুষের মনুষ্যত্ব স্বতই মলিন হয়ে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষার অবাধ প্রচলনের সাথে সাথেই তখন চাকর-

মজুরের সম্ভাবিত দুর্মূল্যতার, আর রায়তজনের অবশ্যম্ভাবী অবাধ্যতার আশঙ্কা আসে। হিসাব ত চিরদিনই সমাজের পকেট-সংস্করণের জন্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে। সমাজের কপালে রাজার টিকা—সে ত বেহিসাবেরই আঙ্গুল-কাটা-রক্তের-টিপ।

বেহিসাবের আতিশয্যের উদ্দীপনায় যদি কেউ আঙ্গুল না কেটে নিজের গলাও কেটে বসে, তাতে তার ব্যক্তিগত যতই ক্ষতি হোক না, সমাজের উন্নতি-স্রোতে তা জলবিম্বের মতই নির্বিবাদে মিশে যাবে। আর বেহিসাবের প্রতি বীতরাগ হয়ে যদি কেবলই সঞ্চয়-প্রবৃত্তির বীজবপনের কাজ চলতে থাকে, তা হলে খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই নিজের আঙ্গুল নিরাপদ করতে পরের গলায় ছুরি বসাবে। হত্যা আর আত্মহত্যা এতদুভয়ের কোনোটিই বরণীয় না হলেও, দুটিই সমান দূষণীয় নয়। বেহিসাবের অবিবেচনার প্রশমনকল্পে সঞ্চয়ের কার্পণ্যের পোষকতা কখনো পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অমিতব্যয়ী বেহিসাবীর যে দণ্ড, তা সেই বহন করে থাকে; আর অপরিমিত সঞ্চয়-লালসার নৈতিক, আর্থিক, পারমার্থিক, সর্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত সমাজের ছোট, বড়, মাঝারি সবাইকেই করতে হয়।

তবু মানুষের সঞ্চয়ের নেশা ঘোচে না। নেশার ধরণই নাকি ঐ। নেশার ঝোঁকে মানুষ যখন পদে পদে ভূমিসাৎ, ড্রেনজাৎ হতে থাকে, তখন তার সন্দেহ হয়—পৃথিবীর

ভারকেন্দ্রের অচলতায়, আর রাস্তার ধারের ঐ ড্রেনগুলোর স্থিতিশীলতায়। এক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে। সংসারের বিকৃতিটাকেই আমরা তার প্রকৃতি বলে ধরে নিয়ে—'জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে'—তারস্বরে ইত্যাকার সব করুণ সুরের সা-রে-গা-মা সাধছি। উচিত আমাদের জমা-খরচের খাতা পুড়িয়ে ফেলে, বেহিসাবের তরফ থেকে, অর্থনীতি-শাস্ত্রের 'পরিশোধিত-সংস্করণ' বের করা।

---

# কথা ও কাজ

মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে তার মুখের কথার ধারাবাহিকতা ব্যাপারটা এতই মৌলিক এবং সনাতন যে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের ব্যাকরণ-সমূহেও ভাষার সংজ্ঞার কোনো অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হয় নি। মানুষের মুখের কথা এবং হাতের কাজের ভিতরে কিন্তু এমনধারা কোনো সহজ পারম্পর্য সহসা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন যা কাজ, তার সম্পাদনে কথার আবশ্যকতা হয়ত খুব বেশি নেই। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের জটিলতা মানুষের যতই বেড়েছে, কাজের আগে কথার ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে ততই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ডাল-ভাত উদরস্থ করা যে এমন একটি অত্যন্ত সোজা কাজ, সেটি করার আগেও শাস্ত্রমতে 'নিবেদন' অবশ্য-কর্তব্য। আর বিবাহাদির মত গুরুতর কার্য সুসম্পন্ন হবার পূর্বে যে উভয় পক্ষে লক্ষ কথার বিনিময়ের ব্যবস্থা,—সে ত আমাদের সকলেরই জানা কথা।

যেখানে কাজের আগে কথাবার্তা কিছুই হয় না, সেখানে কাজটা হয়ে পড়ে নিতান্তই দৈবাৎ। মানুষ, সৃষ্টির আদিকাল থেকে নিজ নিজ অবিবেচনা আর অপরিণামদর্শিতার দায়িত্ব দেবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে। ফলে

দৈবের সদর মফস্বল দু-পিঠই সমান অন্ধকার। দেব-দ্বিজে ভক্তি যতই থাক, সংসারী মানুষ দেবতার 'পরে ভবিষ্যতের বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এটি একটি অত্যন্ত আটপৌরে সত্য কথা। যুগে যুগে অনেক শাস্ত্রের বিধি এবং ধর্মের অনুশাসনের ধোপ এর উপর দিয়ে গিয়েছে; কিন্তু এর পাকা রং দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়েই উঠছে। মানুষের মনের সহজ অহমিকা তাকে দেবতার সমকক্ষ না হওয়া অবধি কিছুতেই দৈবের 'পরে একান্ত নির্ভরপরায়ণ হবার নতি স্বীকার করতে দেয় না। এটি হচ্ছে বিধির বিধি, মানুষের স্বভাব। 'ধর্মশাস্ত্র পাঠ' বা 'বেদাধ্যয়নে' এর পরিবর্তন অসম্ভব। এই কারণেই মানুষের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের উপক্রমণিকা মন্ত্র না হয়ে, হয়েছে মন্ত্রণা।

কিন্তু মন্ত্রণা ব্যাপারটি যে বিশেষ করে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া তা ওর আকারেই প্রকাশ। আমাদের দেশের বর্তমান যুগের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রে এর এই অসমাপিকা আকার এমন অসাধারণ দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ভরসা হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সকল সমস্যার তাপ এই বিরাট মন্ত্রণার চন্দ্রাতপতলে চিরনির্বাণ লাভ করবে। মুমূর্ষু দেহটিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ঘটোৎকচ যদি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স-শরীরে স্বর্গে চলে যেতেন, তা হলে, ব্যাপারটা যা বাস্তবিক ঘটেছিল তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আজগুবি নিশ্চয়ই হতো না; কিন্তু তাতে কুরু-পাণ্ডব কোনো পক্ষেরই কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ছিল না। তাঁর বিরাট দেহের আকস্মিক পাতনেই শত্রু-অক্ষৌহিণীর ধ্বংস সম্ভব হয়েছিল। মন্ত্রণাও যদি শুধু কথার জাল ক্রমাগত বুনে গিয়ে পরিশেষে আপনাতেই আপনি পরিসমাপ্তি লাভ করে, তা হলে যতই সুদীর্ঘ, সর্ববাদিসম্মত এবং বিস্ময়কর হোক না কেন, তা নিতান্তই কথার কথায় পরিণত হতে বাধ্য। উদ্দেশ্যকে সকল দিক থেকে চাপ দিয়ে শৃঙ্খলিত করে সাধ্যের ভিতরে আনাতেই মন্ত্রণার সার্থকতা। এ কথাটাকে যেন আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সমবেত ভাবে কোনো কাজের আশু প্রয়োজন হলেই, আমরা চারিদিক থেকে অজস্র মন্ত্রণার জাল বিস্তার করে অচিরেই সেটিকে লোকচক্ষুর অগোচর করে ফেলি। তারপরে জাল গুটোনোর সময় হলে সবাই অকুতোভয়ে নিজ নিজ কোলের দিকে টানি, এবং জাল নিংড়ে যা পাই, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ কথা-সরিৎ-সাগর।

২

ন্যায়শাস্ত্রকারগণের মতে ধোঁয়া নাকি আগুনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। কিন্তু রান্নাঘরের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা সবাই জানেন যে, অনেক সময়ে ধোঁয়া বিশেষ করে আগুনের অভাবই জানিয়ে দেয়। যে মন্ত্রণার পিছনে ঐকান্তিক কর্মপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ নেই, তা শুধু আমাদের কর্মশক্তিকে আচ্ছন্ন করে মাত্র। এমনধারা কথার মাত্রা যতই কমবে, আমাদের সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধন ততই

সহজসাধ্য হবে। কাজের প্রতি যতক্ষণ না প্রাণের টান আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা কাজের কথা হবে না; আর কাজের দায়িত্ব দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত না হলে, কাজটাকে উপলক্ষ করে কল্পনার আকাশে রং-বেরং-এর ঘুড়ি ওড়ানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। অনেক অসাধ্য তখন আমরা সাধন করব। কথার তোড়ে লিচু গাছকে ছদ্মবেশী আমগাছ আর আমগাছকেই প্রকৃতপক্ষে লিচুগাছ প্রমাণ করে দিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না। দরকার হলে দিনকে রাত, রাতকে দিন আমরা মুখের জোরে তখন করব। এত করেও কিন্তু জমাখরচ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

আত্মারাম সরকারের হাড় ছুঁইয়ে বাজিকর ধুলোমুঠি নিয়ে টাকা বানিয়ে দেয়; এক টাকা থেকে টেনে অনায়াসে দশটা বের করে—কিন্তু পরণের শতগ্রন্থি লুঙি আর গায়ের শত ছিদ্র জামা আর তার ঘোচে না। হাতের বদলে ক্রমাগত হাত সাফাই দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমরা ঘরের অশান্তি আর বাইরের অশ্রদ্ধাই দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছি। এতদিনে অন্তত এটা আমাদের বোধগম্য হওয়া উচিত যে, যে বিদ্যায় রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া সম্ভব, কর্মজগতে তার স্থান নেই। এখানে তেল মাখবার আগেই কড়ি ফেলা চাই। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই কড়ির সংস্থান করতে হয়। লক্ষ্মীলাভের আশায় এক্ষেত্রে কোনো পঞ্চম উপায়ের

প্রয়োগ শুধু যে শাস্ত্র-বহির্ভূতই হবে তা নয়, জাতীয় প্রকৃতির উপরে তার প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী।

মামুদ ঘোরীর সিন্ধু পার হবার বহু পূর্বেকার সেই সুদূর অতীত যুগের সমাজ, যার নিষ্ঠা এবং আদর্শের গৌরব এবং গর্ব আমরা আমাদের পুরুষপরম্পরাগত সহজ উত্তরাধিকার হিসেবে অঙ্গীকৃত করে সময়ে অসময়ে পরম পুলক প্রকাশ করে থাকি,—সে সমাজে পুরুষকারই ছিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এবং এই কারণেই বোধ হয়, তখনকার মানুষের হাতের অস্ত্রের মত তাঁদের মুখের কথারও প্রত্যাহার ছিল না। কথার জন্য তখন রাজ্যত্যাগ, সংসারত্যাগ, পুত্রত্যাগ সম্ভব হতো। আর এখন আমাদের আদর্শ হয়েছে—শতং বদ, একং মা লিখ। আইন আদালতের ভয় না থাকলে, আমরা মনে মনে যে আদর্শটিকে মেনে চলি, তাকে শাস্ত্রীয় আকার দিলে—শত শতং বদ, শতং লিখ, একং মা কুরু—এই রকমই হয়ত দাঁড়ায়। এই 'মা কুরু'র বীজমন্ত্রেই আমাদের সমস্ত কথাকে সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে নিরর্থক করে দিয়েছে। অর্জুনের রথের সামনে বসে অশ্বরশ্মিমাত্র হাতে, কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঝড় ঝাপটা বুক পেতে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার যথারীতি আবৃত্তিতে অর্জুনকে মুগ্ধ করে রেখে, দারুককে ডেকে নিজের রথ আনিয়ে শিঙা ফুঁকে দ্বারকায় চলে যেতেন, তা হলে তাঁর সেই সারগর্ভ বক্তৃতাও অর্থহীন প্রলাপেই পর্যবসিত হতো। দ্বৈপায়ন ঋষি সে

গীতাভিনয় সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ করলেও শ্রীমদভগবদ্‌গীতা নামে নিশ্চয়ই তাকে অভিহিত করতেন না।

আমরাও কর্মজগতে বহুদিন ধরে গীতাভিনয়েরই চর্চা করে আসছি। যুদ্ধে বাকপটুতা এবং সভায় বিক্রমপ্রকাশ ক্রমশ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হয়ে আসছে। কথার মাত্রা হিসেবে মাঝে মাঝে আমাদের যে সব অঙ্গ-সঞ্চালন, তাতে শুধু আমাদের কর্মশক্তির নগ্ন দারিদ্র্যই ফুটে উঠছে। রবাহুত হয়ে কাজ যতবারই আমাদের দুয়ারে এসেছে,—অতৃপ্ত ফিরে গিয়েছে। অভিনয়ের আবেগে, বহু আড়ম্বরে সর্বস্ব পণ করে, দেবার বেলায় দিয়েছি আমরা শুধু তাকে আমাদের মাথার 'পরের কর্মবৈমুখ্যের বোঝাটিকে ঘুরিয়ে বসানোর ভার। সদা-সতর্ক মন আমাদের কালের ইঙ্গিতে অনিশ্চিত কল্যাণের দিকে পা না বাড়িয়ে, সমধিক আগ্রহে সুপ্রতিষ্ঠিত জড়তাকেই আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে। এই জাগ্রত আবিষ্টতার ফলে জাতীয় বা সামাজিক যত কিছু আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সবই হয়েছে মৃতজাত বা জীবন্মৃত।

৩

কর্ম-পরিচয়ে আমাদের এই যে অচল অধম দশা, এটাকে ঘর এবং পরের কাছ থেকে সর্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যেই আমরা যখন তখন মুখে মুখে মোহমুদ্গর পরিচালনা করে থাকি। কিন্তু এতে করে আমাদের মুখ ব্যথা হওয়া ছাড়া

আর কোনোই ফল হয় না। জাতিকে তার নিজস্ব প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে কর্মপ্রেরণা, সমাজকে আমাদের আদর্শের দিকে উন্মুখ করে তুলতে যে আন্তরিকতা নইলে নয়,—তার সন্ধান যত দিন পর্যন্ত আমরা নিজেদের ভিতরে না পাবো, তত দিন পর্যন্ত, আমাদের সব কথা এবং কাজই মিথ্যা, বৃথা ছলনামাত্র হবে। রূপহীন যে, সে মুখে চুন ঘসলেও লোকে হাসবে, কালি মাখলেও কেউ মুগ্ধ হবে না। ও উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসই আমাদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সেই ত্যাগই হবে আমাদের মুক্তিপথের প্রথম সোপান।

শুদ্ধমাত্র পুথিগত বিদ্যার অভিমানবশেই আমরা মনে করি, আমরা আমাদের সমাজকে এবং জাতিকে চিনি ও জানি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে,—কর্ম ছাড়া জ্ঞানলাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, যেখানে সমাজের বাঁধন অত্যন্ত শিথিল বলে আমাদের অনেকের ধারণা, সেখানে সামাজিক হিতসাধনের জন্য অসংখ্য কর্মিসংঘ নানা দিকে নানা কাজে সদাই ব্যস্ত। এমনই করে কাজের ভিতর দিয়েই সে সব দেশে সমাজের সর্ব স্তরের ভিতরে জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। আর আমাদের দেশে?

অতীত যুগে যখন অন্ন-সমস্যার প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ু-পরিমাণ দিন দিন ক্ষীণ এবং ক্ষীণতর হতে সুরু হল, খুব সম্ভব তখনই আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে

আত্মরক্ষা করবার জন্যে, বাধ্য হয়ে, অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত অর্ধেক হচ্ছে—বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ঐ দুই আশ্রমের কাজই ছিল স্বতঃপরতঃ সমাজের হিতসাধন—নিঃস্বার্থ ভাবে। আমাদের সামাজিক জীবনে তখন ভাটা পড়ে এসেছে। যাকে কালোপযোগী আকার দিয়ে, গার্হস্থ্য সংস্করণে পরিণত করে, সমাজের অঙ্গীভূত করে ধরে রাখা উচিত ছিল, আমরা তাকে নির্বিবাদে বিদায় দিয়েছি। সেই থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিধিব্যবস্থা আমাদের সমাজ-শাস্ত্রে ত নেই-ই, বরং পরের খেয়ে ঘরের মোষ বাড়ানোর প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে ঢুকেছে। আমাদের মনের অভিধানে 'সমাজ' 'জাতি' এ সব শব্দের অর্থের ঠিক সেই ধরণের অবনতি এবং বিকৃতি ঘটেছে, যে ধরণের বিকৃতির ফলে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় 'পরিবার' মানে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী।

সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাবের ফলেই আমাদের ভিতরে এই সব সঙ্কীর্ণতা এসেছে। কথার ফুৎকারে এ অপসারিত হবার নয়। 'সমাজ' এবং 'জাতির' বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ এবং জাতি রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের শুধু কর্মের ভিতর দিয়েই হওয়া সম্ভব। আর, সে পরিচয় সংসাধিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে অন্তর্হিত হবে। কারণ সমাজের পিঠে গুরুগিরি ফলানোর প্রবৃত্তি, অথবা সমাজের পক্ষে ওকালতি করবার উৎসাহ, এ দুই-ই তখন

নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। তখন সমাজ হবে সজীব—আমাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও স্বরূপে ফুটে উঠবে স্বতই। তখন আমাদের সমাজ হবে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ভালো-মন্দর সম্মিলিত নিদর্শন।

এখন আমরা সমাজের ভিতরে থেকেও সমাজ-ছাড়া; জাতি হয়েও জাতিহীন। সমাজের পক্ষে সহজ, সবল সহানুভূতি এবং নিত্য, অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করবার মত কর্ম-প্রবণতা সাধারণ ভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল। এর ফলে, যখনই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার বিরোধ ঘটে, তখনই হয় আমরা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানা প্রকার প্রলাপের প্রলেপ দিয়ে বিরোধের ব্যথা চেপে রাখি; নয়ত বিদ্রোহ করি। সমাজকে হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে আমরাও গিয়ে হোটেলে ঢুকি।

নিজের জিনিসের প্রতি মানুষের একটা সহজ অধিকারের আনন্দ বা দায়িত্ববোধ,—একটা মমতা থাকেই। কিন্তু এ মনোভাবের সম্যক বিকাশ নিশ্চয়ই চর্চাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজের প্রতি আমাদের যে মমতাবোধ, সেটাও খুব সম্ভব, চর্চার অভাবে, আমাদের মনোবৃত্তির ভিতরে সম্যক পরিণতি লাভের সুযোগ পায় না। এই কারণেই সমাজের ভালোমন্দর প্রতি আমরা, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা উদাসীন। সমাজের কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত

আমাদের গা ঘেঁসে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অত্যন্তই নির্লিপ্ত ধরণের হয়ে থাকে। তাতে আমাদের সৎবুদ্ধির পরিচয় যতই থাক, সমবেদনার ছাপ প্রায়ই থাকে না।

কিছুদিন আগে স্নেহলতার আত্মাহুতিতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। গদ্যে পদ্যে অনেক লেখালেখি হয়েছিল, সভাসমিতিও হয়েছিল বিস্তর। এবং তাতে দেখা গিয়েছিল—পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই আমরা শতমুখ এবং সবাই আমরা একমত। কিন্তু একমত হয়ে আমরা করেছি কি? নূতনত্ব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ও সব ব্যাপারকে একটি নূতনতর দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের দলভুক্ত করে দিয়ে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছি। এমনই-ধারা কর্মবিমুখতার দরুণ আমরা ক্রমশ নিজেদের কাছেই নিজেরা ঝুটা বনে গিয়েছি। আমাদের তথাকথিত ভাবপ্রবণতা, বাক্‌প্রবণতার ভিতর দিয়ে গিয়ে, হুজুগপ্রিয়তায় পরিণত হয়েছে।

৪

আমাদের কথার সঙ্গে কাজের অসহযোগ এবং বৈসাদৃশ্য যে কত বেশি, তা আমাদের কথাসাহিত্যের সঙ্গে কর্মসংহিতার তুলনা করলেই ফুটে উঠবে। মুখে মুখে আমরা ললিতা-সুচরিতা-দত্তা-পরিণীতার চর্বিত চর্বণ করি; আর কাজের বেলায় নিজের ঘরের খুকি দশ বছরে পা দিতে না দিতেই আমাদের আহার কমে যায়, নিদ্রা ঘুচে যায়। আমরা তাকে 'পাত্রস্থ'

করবার চেষ্টায় প্রাণপণ করি। যে পরিমাণ চেষ্টা আমরা, বাধ্য হয়ে, 'কন্যাদায়' হতে মুক্তি পাবার প্রয়াসে ব্যক্তিগতভাবে করে থাকি, তার সিকির সিকিও যদি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমবেতভাবে 'বরপণে'র উৎপীড়ন থেকে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টায় ব্যয় করতাম, তা হলে সমাজের অনেক সমস্যার উপরেই, হয়ত, মীমাংসার আলো এসে পড়ত। কিন্তু তা ত হবার নয়। ললিতা-সুচরিতা, ওঁরা কথাসাহিত্যের পটেই আঁকা থাকবেন; —কাজের বেলায় 'গৌরীদান'ই হবে আমাদের লক্ষ্য।

সব বিষয়েই ঐ এক কথা। আমাদের জীবনের, সমাজের, যে সব সম্ভাবনাকে সাহিত্য-প্রতিভা আকার দিয়েছে, আমরা সেগুলোকে অনায়াসে, অবলীলাক্রমে কল্পলোকে অন্তরিত করে, সেখানেই তাদের যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেছি। কথা-সাহিত্য আমাদের কাছে উপকথায় রূপান্তরিত হয়ে শুধু অবসর-বিনোদনের উপাদানেই পরিণত হয়েছে। তার ইঙ্গিত এবং প্রেরণা আমাদের মৌতাতের খোরাক যোগায় মাত্র;—কর্মের উদ্দীপনা ভুলেও জাগায় না। 'ম্যাটসিনি লীলা' চিরদিনই আমাদের কাছে "সরেস" থেকে যায়!

সমালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায়, আমাদের কথাসাহিত্য নাকি ক্রমশঃই অ-জাতীয় হয়ে উঠছে। এ অভিযোগের মূলে অনেকখানি সত্য আছে। যে সমাজে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, গোষ্ঠি—আরও কত কি,—এবং সর্বশেষে কোষ্ঠির মিলামিল যোগাযোগ না হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন

অসম্ভব বা অবিধি, সেখানে জাতীয় ধারায় কথাসাহিত্যের প্রসার যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, সে কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু, যথাবিধি ঘটকের মুখে নায়িকার রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি এবং ঘরবাড়ী জেনে শুনে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা উপন্যাসের নায়ক হিসাবে কি যে করতে পারি, তা ত কবিগুণাকর সবিস্তারেই লিখেছেন। ওদিকে আমাদের সামাজিক জীবন এমন বৈচিত্র্যহীন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমাদের সাহিত্য অন্য কোনো দোষাশ্রিত না হলেও পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবেই।

আসল কথা, আমাদের জাতীয় জীবন, খুব সম্ভব, এখনও সৃষ্টির অপেক্ষা করে রয়েছে। যা আছে সেটা হচ্ছে জাতীয়-জড়তা। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত জাতীয়তার দোহাই ব্যাপারটা আমাদের প্রকৃতিগত জড়তার ওজর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যের রসসংগ্রহে আমরা আরব-পারশ্য থেকে সুরু করে সুদূর নরওয়ে-সুইডেন পর্যন্ত সর্বত্র যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজদেহে সাহিত্যের রসায়নের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা সদাই সন্ত্রস্ত। অনুপানে আমাদের বিশেষ আপত্তি নেই, বরং যথেষ্ট আগ্রহই আছে; কিন্তু ওষুধ আমাদের ধাতে কিছুতেই সইবে না। এ আমরা আগে থেকেই জেনে বসে রয়েছি। এ সর্বজ্ঞতার মূলে কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকর্মের অভিজ্ঞতা নাই; আছে শুধু আমাদের বহুযুগের জেরটানা জড়তা।

এমনধারা সর্বজ্ঞতার সতর্কতা কর্মজগতে আমাদের সর্বতোমুখী জড়তারই অন্যতর উপসর্গ। প্রকৃতির রাজ্য যে এমন অচঞ্চল নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা; সেখানেও ত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অমন কতশতই হচ্ছে। সে সব যদি প্রাকৃতিক মহা-নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়ে, অন্তর্ভুক্ত এবং অনুবর্তীই হয়, তবে কর্মের পথে আমাদের যে সব ভুলভ্রান্তি, স্খলন-পতন, ত্রুটিবিচ্যুতি, সে সবও আমাদের সাথের সাথী বলেই মেনে নিতে হবে। ভগীরথের যে এত স্তবস্তুতি, এত সাধ্যসাধনা, এত পুণ্যের জোর, তবুও তো স্বর্গ-মন্দাকিনী সগরবংশের ভস্মাবশেষের উপর সরাসরি এসে নামেন নি। অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে, অসংখ্য বাঁক ঘুরিয়ে, বহু ফাঁড়া কাটিয়েই তাঁকে আনতে হয়েছিল।

আমাদেরও কর্মের ভিতর দিয়ে বোঝাপড়া করতে করতেই জাতীয় ভবিতব্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কর্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত বাকপ্রবণতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে সন্দেহ নেই; কিন্তু তখনই আমরা আমাদের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতার সন্ধান পাবো। আজ যে কথা আমাদের ভালো লাগে, তখন তা আমাদের ভালো করবে। আন্তরিকতার আলোতে কথার হাওয়া থেকে তখনই আমরা গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব। শুদ্ধ তখনই আমাদের মন, আমাদের আশা, আমাদের কাজ, আমাদের ভাষা ভগবানের বরে সত্য হয়ে উঠবে।

# বাংলার মা

'আসক্তিপরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশপালনের অনর্থ বহন করে অপমানের মধ্যে, অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে এমন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়-রাজত্ব-বিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশী শাসনের হাতকড়ির নির্মমতার দ্বারাও হয়নি'—( পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী—রবীন্দ্রনাথ )।

যে দেশে 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য', সে দেশে সন্তানের জীবনরাজ্যে মায়ের এমন নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পরিকল্পনা কবির পক্ষে নিতান্তই আর্য প্রয়োগ হয়েছে। আর, এর ফলে কারও হেঁটমুখে সান্ত্বনার হাসি ফুটে উঠবে কি না জানি না, তবে পুত্রগর্বে গর্বিতা অনেক মাতার ফুল্ল মুখেই আত্মসন্দেহের ছায়া নেমে আসবে—এ সুনিশ্চিত। দু এক স্থলে আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশের সম্মুখে আত্মবলিদান বিরল না হলেও, মাতৃভক্তির অমন উগ্র সংস্করণ দেশের সন্তানদের মনোরাজ্যে যে ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের মত ব্যাপকভাবে বাসা বেঁধেছে এমন আশঙ্কা করবার মত প্রমাণ আমাদের সমাজেও নেই, সাহিত্যেও নেই।

সর্বত্রই ত দেখি, ছেলেদের যা ঝোঁক ওঠে তা তারা করেই,—মায়ের অশ্রু এবং আবেদন সম্পূর্ণ অবহেলা বা অগ্রাহ্য করেই। ত্রেতায় কৌশল্যার আসক্তির টান শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি; দ্বাপরেও মা যশোদার স্নেহের নীড়ের সহস্র আবেদন শ্রীকৃষ্ণের কর্মস্পৃহাকে আবিষ্ট রাখতে পারে নি; আর কলিযুগে মায়ের আসক্তির টান আর চোখের জলের মূল্য যে কতখানি তা এ যুগের কবি তাঁর 'চোখের বালি'তে চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়েছেন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের দেশের তথাকথিত নাবালকের দল বিবাহে পণ-গ্রহণের সময় পিতার একান্ত অনুগত এবং দারান্তর-পরিগ্রহণের বেলায় মায়ের পরম বাধ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ও সব কাজের দরুণ সমাজে যদি, চিরজীবনের কথা দূরে থাক, ক্ষণকালের জন্যেও কারও মাথা হেঁট হবার সম্ভাবনা থাকত, তা হলে আনুগত্য এবং বাধ্যতা অতটা স্বত-উৎসারিত হত না। আসল কথা, গোবধের সময়ে খুড়ো কর্তা হিসেবেই সাধারণত মায়ের আসক্তির টানটাকে আমল দেওয়া হয়ে থাকে। নইলে, মায়ের অন্যায়-আদেশ-পালনের অনর্থ বহন করবার মতন বীরত্ব যদি সত্যিই আমাদের ঘরে ঘরে থাকত, তা হলে মায়েদের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও শ্রী অচিরেই ফিরে যেত।

লালায়িত আসক্তিই দেশের পৌরুষকে গ্রাস করেছে,

কিম্বা তন্দ্রাহত পৌরুষই গিয়ে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়েছে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর, যে পৌরুষ মায়ের আঁচলের কোণে বাঁধা পড়ে রয়েছে, তার বহরও যে খুব বেশি বিপুল নয়, এ কথা, বোধ করি, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এ হতভাগ্য দেশে এই অভিশপ্ত যুগেও যে দু একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কর্মের কুশলতা এবং চিন্তার উদারতা জগতের বিস্ময় এবং অর্ঘ্য আহরণে সমর্থ হয়েছে, তাঁদের মায়েদের মনের অপত্যস্নেহকে বিশ্লেষণ করলেও তাতে ত্যাগ এবং আসক্তির রাসায়নিক অনুপাত, খুব সম্ভব, এদেশের জলহাওয়ায় যেমনটি হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তেমনটিই দেখতে পাওয়া যাবে।

এ দেশের পৌরুষ মায়ের আসক্তিপরায়ণতায় শৃঙ্খলিত হয় নি। মায়ের টানের চেয়ে এদের ঘরের টান ঢের বেশি। আর ঘরের টানের চেয়ে এদের প্রাণের টান আরও বেশি। আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি—এই হচ্ছে এ দেশের হিতোপদেশের অমূল্য নির্দেশ! মায়ের ত্যাগের আলোতে যদি অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে একই সময়ে একই দেশে সতীদাহ আর বহু-বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার কথা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করতে পারত না। ছেলেরা অমানুষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মনও ছোট হতে সুরু করেছে।

কুন্তী যখন ত্রস্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অভয় দিয়ে বালক ভীমকে পাঠিয়েছিলেন দুর্দান্ত বক রাক্ষসকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে, তখন তাঁর মনের কোণে সম্ভবত ত্যাগ বা আসক্তির কথা মোটেই ওঠে নি। ভূভারতে কোনো রাক্ষসই তাঁর ভীমকে এঁটে উঠতে পারবে না এই বিশ্বাসই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর, এখনকার মায়েরা যে ছেলে চোখের আড়ালে গেলেই অন্ধকার দেখেন তারও কারণ তাঁদের অন্তরের ত্যাগের অভাব বা আসক্তির টান নয়। সন্তানের সামর্থ্যে বিশ্বাস এবং নির্ভরের একান্ত অভাবই তাঁদের এ দুর্বলতার মূল কারণ। বিদ্যাসাগরের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, অক্লান্ত কর্মশক্তি, আর পরের দুঃখে অফুরন্ত সহানুভূতিই তাঁর মায়ের মনের তারে নূতন সুর ধ্বনিত করে তুলেছিল। নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী তাই বালবিধবার দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে ছেলেকে অনুরোধ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মত ছেলে না পেলে অমন দেশাচার-বহির্ভূত কথা তাঁর মনেও উঠত না, মুখেও ফুটত না। সব মায়ের ভাগ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মত ছেলে না জুটলেও, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে—দেশের কর্মের শক্তি এবং চিন্তার ধারা আবার যখন পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্ব্বতোমুখীন হবে, তখন দেশের মায়েদের মনও পিছিয়ে পড়ে থাকবে না।

যে দিন থেকে ছেলেরা বৃহৎ জগৎ থেকে বিমুখ হয়ে সামাজিকতা আর পারিবারিকতার দুর্গের প্রাচীর-গঠন আর

পরিখা-খননেই আত্মবিনিয়োগ করেছে, সেই দিন থেকেই, হয়ত, মায়ের মনের উৎসও জমাট বাঁধতে সুরু করেছে। মৃতবৎসা জননীর স্তন্য আপনা হতেই শুকিয়ে আসে। প্রকৃতির রাজ্যে বাজে খরচ হবার উপায় নাই। রাজপুতজীবনে যখন যুদ্ধবিগ্রহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, শোনা যায়, তখন রাজপুতমহিলারা না কি মাথার চুলে স্বামীপুত্রের ধনুকের ছিলা তৈরি করে দিতেন—দরকার হলে। আর, এখন রাজপুত তার যুদ্ধের নেশা প্রায়শই আফিং দিয়ে মেটায়, কাজেই, রাজপুত-মহিলাদের চুল যথাস্থানেই থাকে, আর বছরের পর বছর আফিংএর কসে তাদের হাতের তেলো ক্রমশ পরিপক্ক হয়। সেকালে যে সময়টা ধনুকবাণ, বর্মচর্মের তত্ত্বাবধানে কাটত, এখন তার চেয়ে ঢের বেশি সময় আফিংএর ক্ষেতে অতিবাহিত হয়। কিছুদিন আগেও হিন্দু পরিবারে ছেলেপিলেরা ভোরে শয্যাত্যাগের পূর্বে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শিবস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, আরও কত কি মুখে মুখে শিখত, আবৃত্তি করত। আর, এখন মায়ের ক্রোড়রাজত্বের ও বিভাগে স্বরাজ স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। যে সময়টা 'পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্য-শ্লোকো যুধিষ্ঠির' করবে সে সময়টা বাতি জ্বেলে নিয়ে দু ঘর নামতা বা দু পাতা হিস্ট্রি কেতাব মুখস্থ করলেও আখেরের কাজ হবে। এ বিষয়ে ছেলে এবং ছেলের বাপের ভিতরে কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নেই।

ঐ যে ছেলের আখের,—ও বিষয়ে চিরদিনই ছেলের মা

ছেলের বাপের মুখেই ঝাল খেয়ে আসছেন। ফলে, এ দেশের ছেলেদের কর্মজীবনের সঙ্গে মায়েদের সম্বন্ধ ‘জয় হোক’ থেকে নামতে নামতে ‘সোনার দোয়াত কলম হোক’ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এর পরে যখন ও আশাও থাকবে না, তখন মায়েদের শুধু “বেঁচে থাকো” বলেই তুষ্ট থাকতে হবে। মায়ের মনের এই যে ক্রমবর্ধনশীল কৃপণতা এর জন্যে দায়ী কে!

---